বর্ষ ২, সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর ২০১৩ - জানুয়ারি ২০১৪ মূল্য ₹১০
Vol.2, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2013 - Jan 2014, Price ₹10/- only

প্রভুবার্তা

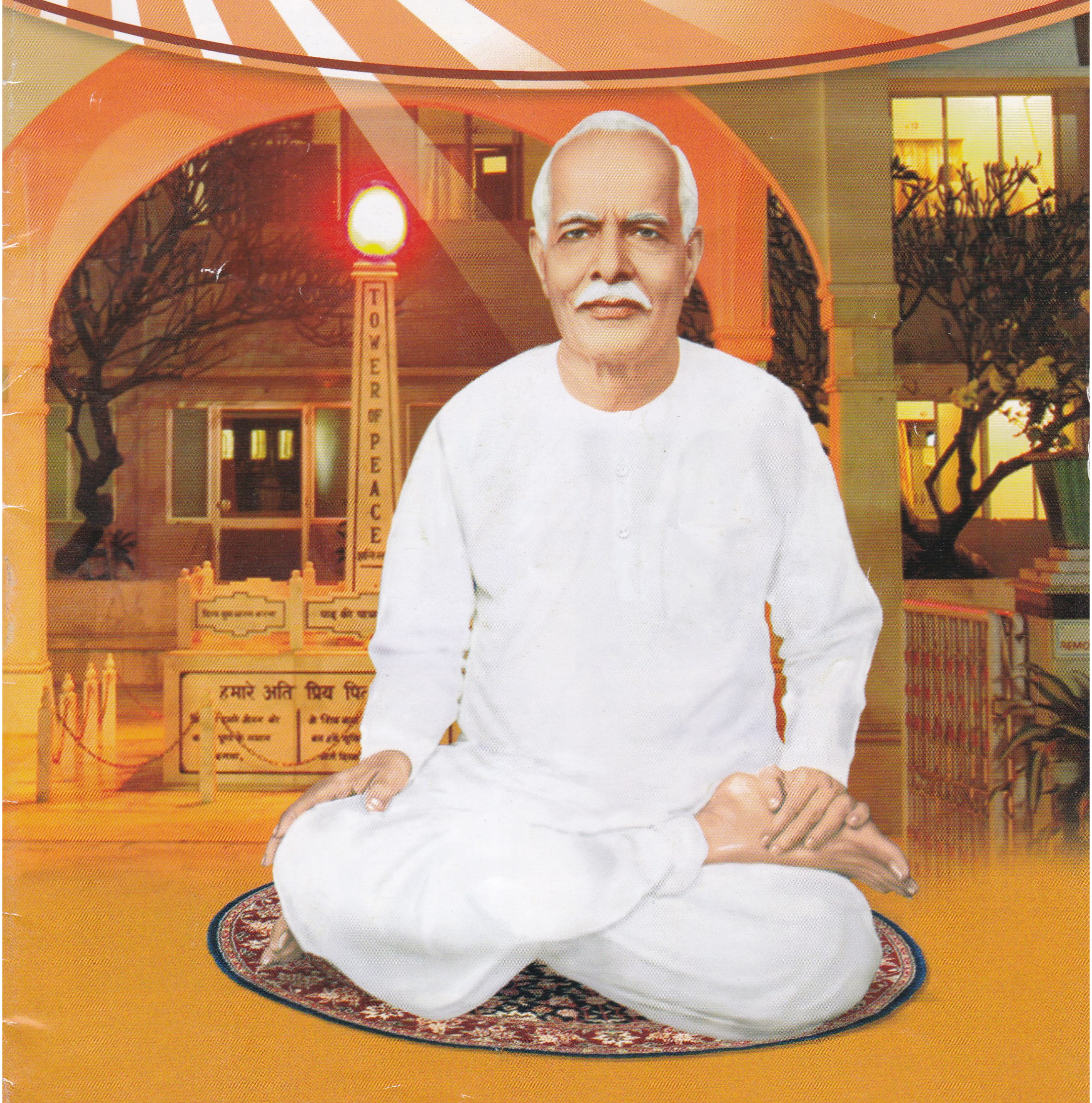

Vol.2, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2013 - Jan 2014, Price ₹10/- only

গুমলা ঃ 'শান্তিদূত'-এর সম্বর্ধনায় ভ্রাতা রাকেশ বনশল, এস. পি., ভগিনী শ্রীমতী বীণা শ্রীবাস্তব, বি. কে. কানন, ভ্রাতা কমলেশ উৎসব, ভ্রাতা সুদর্শন ভগত, ফাদার টমাস বারলা ও অন্যান্যরা।

আমতলা ঃ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আমতলায় আয়োজিত জীবন্ত দুর্গা প্রদর্শন সঙ্গে বি. কে. অঞ্জনা, বি. কে. কানন, বি. কে. মুন্নি ও অন্যান্যরা।

শ্যামনগর ঃ শান্তির বাণী বহিছে আনি শান্তিদূত শ্যামনগরে সাথে বি. কে. কমলা।

বরাহনগর ঃ 'দুর্লভ জীবন নির্মাণ সোসাইটি' ও 'ক্যানসার পরিচর্যা সংগঠন' আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ক্যানসার রোগ বিশেষজ্ঞ ভ্রাতা ডাঃ সুলতানিয়াজী, বি. কে. কিরণ, বি. কে. পিংকি, ভ্রাতা মহেশ আগরওয়াল, সচিব, বরাহনগর দুর্লভ জীবন নির্মাণ সোসাইটি।

দিল্লী ঃ লোধী রোড, ইরেডা, ভারত সরকারের কর্মীদের উদ্দেশ্যে 'রাজযোগ সুস্বাস্থ্যের সহায়ক' বিষয়ক একদিনের কর্মশালার অন্তে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বি. কে. পীযুষ।

বাঁকুড়া ঃ কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বি.কে. শেফালী।

মেট্রোপলিটন ঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজযোগ সম্বন্ধে ভাষণরত বি.কে. সুশীল, বি. কে. ধনেশ্বর, বি.কে. স্নিগ্ধা, বি.কে. মুন্নি, বি.কে. কানন ও সমিতির সদস্যগণ।

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কতজন আসে যায়, হাসে-কাঁদে, খেলে বেড়ায়, স্বপ্ন গড়ে ইমারত বানায়, জীবনাবসানে ঘরে ফিরে যায়। কে তার হিসাব রাখে? সবার অলক্ষ্যে তারা আসে, অলক্ষ্যেই ফিরে যায়। তার স্বপ্ন, তার সৌধ হয়তো-বা কিছুকালের জন্য স্মৃতি হয়ে রয়, বা ইতিহাসের পাতায় তা স্থান পায়। তাও আবার কালক্রমে বিলীন হয়ে যায়, বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়। বেশির ভাগেরই নিঃশব্দ আগমন, নীরব প্রস্থান গুটি কয়েক ছাপ রেখে যায়। মুষ্টিমেয় আসে জীবনের গতি বদলে দেয়।

বোনাপার্ট নেপোলিয়ান থেকে শুরু করে হিটলার পর্যন্ত ছাপ রেখে যাওয়া কুশীলবের গতি সেন্ট হেলেনায় অথবা গর্ভগৃহে শেষ হয়ে যায়। কিসের তরে মানুষ এ সকল করে? নিজ দম্ভ প্রতিষ্ঠার ভরে। কালিমালিপ্ত পাতা জোড়ে! কত মানুষের অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও ক্লেশের কারণ হয়ে বহুদিন রয়ে যায়। তাই দম্ভ কখনো চিরস্থায়ী হয়নি। হিংসা কখনো চিরসুখ দেয়নি। নেতিবাচক কর্মসকল ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেও মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে হিংসা-ঈর্ষা-দ্বেষ, লোভ-লালসা যতই ইমারত গড়ুক না কেন তা একদিন ভেঙে পড়বেই। বিশ্বজয়ী দশাননের সোনার লঙ্কা একদিন পুড়ে ছারখার হবেই।

ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা অবলোকন করে তাপস বিজ্ঞানী আলফ্রেড্ ব্রেনহার্ড নোবেল থেকে শুরু করে হিরোসিমা নাগাসাকি পর্যন্ত মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পুনঃপুনঃ জাগরিত হয়েছে। হিংসা নয় শান্তি; ধ্বংস নয় সৃষ্টি! ঘৃণা নয় ভালোবাসা! এসকলই আমাদের প্রকৃত প্রকৃতি, স্বতঃ ভাব। ঝড়-ঝঞ্ঝা যেমন প্রকৃতির সাময়িক বিচ্যুতি তা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। তেমনই ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষও। মানবমন প্রকৃতপক্ষে শান্ত, সুন্দর, সুকুমার সমুজ্জ্বল।

ব্যথিত মনে প্রশ্ন আনে, কিসের তরে মানুষ এমন করে? উত্তর আসে, অজ্ঞানতা বশে মানুষ সকল ভুল করে। মহামনীষী আইনস্টাইনের ভাষায়, "সত্যের অবগুণ্ঠন যতই উন্মোচিত হচ্ছে ধোঁয়াশা ততই ঘনীভূত হচ্ছে।" তাই সত্যের খোঁজ চিরন্তন, এ খোঁজ নিরন্তব, এ প্রবাহ চলবে যতদিন না তা উৎসে পৌঁছায়।

উৎস কোথায় ? গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে উত্তর করিত, মহাদেবের জটা হইতে। আজীবন এই সত্যের খোঁজ, উৎস সন্ধান! কে দেবে দিশা? কে দেখাবে পথ? তিনি উৎস, তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই জানেন সব! কি করে পাব তাঁরে? তাঁর প্রতিশ্রুতি ভরে তিনি আজ তব দ্বারে। কি করে বুঝব তাঁরে? সূর্য উদিত হলে অন্ধকার যায় চলে। তাহলে কেন এত অন্ধকার এই সংসারে! গৃহদ্বার বন্ধ হলে পরে সাধ্য কার আঁধার হরণ করিবারে।

তাই আজ সময় হয়েছে দ্বার খোলার। উন্মুক্ত করো নিজেরে, দৃষ্টি দাও অন্তরে। তিনি এসে নিজ বেশে দেখায়েছেন সবারে। আজ থেকে প্রায় ৭৭ বছর আগে স্বয়ং ঈশ্বর সত্যেশ্বর শিব ধরায় অবতীর্ণ হয়ে মানবমনে জ্ঞানালোক প্রজ্বলনে পিতাশ্রী প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে নিমিত্ত করেন। মানবমনে বিশ্বাস স্থাপনে তাঁর সকল গুণ, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য দিয়ে সাজিয়ে দেন তাঁকে। তাঁর কর্ম, বাণী আবহমানকাল ধরে মানবের জীবনবেদ হয়ে যায়। একবার পথের নিশানা পেলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যেমন সহজ হয়ে যায়; ঠিক তেমনি তিনি আজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়েছেন আমাদের। "নিজেকে দেহীবোধে আমায় স্মরণ কর। আমি তোমাদের সকল পাপ মুক্ত করে নিজ ঘরে নিয়ে যাব।"

সময় হয়েছে ঘরে ফেরার, বেলা যে পার হয়ে যায়!

- ব্রহ্মাকুমার সমীর

অমৃত সূচি

১।	সম্পাদকীয়	১
২।	সঞ্জীবনী বুটি	২
৩।	বাবার স্নেহে দেহবোধ ভুলে যেতাম	৩
৪।	স্নেহবল	৬
৫।	স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ	৭
৬।	প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজিব	৮
৭।	যোগ বা Meditation	১০
৮।	আদিদেব	১২
৯।	খুশির উৎস সফলতা	১৪
১০।	পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা	১৫
১১।	অপার্থিব রাসলীলা প্রসঙ্গে	১৮
১২।	ডাক	১৯
১৩।	বাবার সঙ্গের রঙ মেখেছি	২০
১৪।	ভরা থাক স্মৃতি সুধায়	২২
১৫।	ভগবানের অবতরণ	২৪

নতুন বাংলা বানান বিধি অনুসৃত

Important Information :
All Email communications for this Bengali Magazine (Prabhubarta) must be sent to **bm@bkprabhubarta.org** only
Phone : 033-2475 3521
033-2474 5251
Annual Subscription : ₹60/-

প্রচ্ছদ পরিচিতি

অব্যক্ত করেছ আপনার সন্তানেরে ব্যক্ত করিবার তরে
তাই তো তব উপস্থিতি সর্ব চরাচরে বিশ্বমাঝারে।

সঞ্জীবনী বুটি

নেত্র-দানকে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়। সবচেয়ে বড় জীবনদান বল বা বরদান বল কিংবা মহাদান বল, বাস্তবে এটাই। তুমি তোমার 'লাইট' এবং 'মাইট' দ্বারা ডিভাইন ইনসাইট বা 'তৃতীয় নেত্র' দান কর, যার দ্বারা মানুষ মুক্তি ও জীবন্মুক্তির প্রকৃত দিশা পায়।

বাবার স্নেহে দেহবোধ ভুলে যেতাম

(স্মৃতিদিবসের স্মৃতিচারণা)

সাকার বাবার সাথে অতিবাহিত দিনগুলির স্মৃতি বারংবার স্মৃতির মণিকোঠায় উঁকি দেয়। ঘটনা ও দৃশ্যগুলো ফিল্মের রিলের ন্যায় স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কীসব অমূল্য ঘটনা-প্রবাহ যার সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। যখন একান্তে বসে ওসব ভাবি তখন মনে হয় এখন আমি কোথায়? যদি কোন বৃদ্ধের সাথি তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন ওই বৃদ্ধ তখন যুবকদের সাথি করে তাদের সাথে মেলামেশা করেন এবং উৎসাহে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্তরে অনুভব করেন, আমার সমসাময়িকরা চলে গেছেন। আমাকেও যেতে হবে। আমারও কিন্তু ওরকমই অনুভব হয়।

যজ্ঞের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। আমরা পাঁচ ভাই ছিলাম। বিশ্বকিশোর দাদা, বিশ্বরতন দাদা, আনন্দকিশোর দাদা, চন্দ্রহাস দাদা এবং আমি। আজকে যে জাঁকজমক রূপ, এতসব ভাই, এঁরা কেউ তখন ছিলেন না। ১৯৭২ সালের পূর্বে এঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল না। বাহাত্তর কিংবা বাহাত্তরের পরে আজ যেসব বড় বড় ভাইয়েরা আছেন তারা মধুবনে এসেছেন। খুব অল্পই তখন ভাইবোন ছিল যাঁরা আমার পূর্বে এসেছেন। ওম্ মণ্ডলীতে থাকা পুরনো ভাইবোন ও সমর্পিত পরিবার সমূহই শুধু ছিল।

যজ্ঞের সাথে এক অদ্ভুত সম্পর্ক

আমি দারুণ সৌভাগ্যবান এজন্য যে, এমন কিছু মানুষের সঙ্গ পেয়েছি যাঁরা যজ্ঞের প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন এবং বিশেষ করে যাঁরা ব্রহ্মাবাবার সাথে জড়িয়ে ছিলেন। ব্রহ্মাবাবার লৌকিক পত্নী, তাঁর কাছে বসে ব্রহ্মাবাবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি। বাবার লৌকিক বউমা বৃজেন্দ্রা দাদিজির কাছেও অনেক কিছু জেনেছি। বাবার লৌকিক কন্যা নির্মলশান্তা দাদিজি যজ্ঞের অনন্য অঙ্গ, তাঁর সাথে; এছাড়া ব্রহ্মাবাবার বোন, মাম্মার লৌকিক মা - এঁদের সকলের সাথে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে। মাম্মার লৌকিক মা ভোগ অর্পণ করতেন। একটা বিষয় আমার খুব আশ্চর্য লাগত এখানে শরীরের সম্বন্ধ উধাও হয়ে গেছিল। মাম্মার মা নিজের মেয়েকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। এখানে আত্মিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের আধারে একে অপরের সাথে ব্যবহার করতেন। এখানে আর একটি অদ্ভুত বিষয় আমাকে অবাক করেছিল, ব্রহ্মাবাবার ধর্মপত্নি ব্রহ্মাবাবাকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। অজ্ঞানকালে যাঁকে স্বামী রূপে দেখেছেন তাঁকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। এ শুধু বলার জন্য বলতেন না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং চলন এমন ছিল তাতে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যেত ব্রহ্মাবাবাকে 'বাবা' ভেবেই চলতেন। এসবই স্তম্ভিত হওয়ার মত বিষয় ছিল। ধীরে ধীরে এঁরা সব চলে গেলেন। নতুন নতুন মুখের আগমন হল, সমাগম বাড়তে লাগল। যতদিন যায় তার কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকল। আজ শান্তিবন হোক কিংবা জ্ঞান-সরোবর, পাণ্ডব ভবন হোক বা বিশ্বব্যাপী সেবাকেন্দ্র হোক সব জায়গায় কী বিশাল সংখ্যক ভাইবোনের আনাগোনা কিন্তু বাবা, মাম্মা, দাদিরা এবং বড়ভাইদের সাথে যে দিনগুলো কাটিয়েছি তা আর ফিরে

আসবে না। আমার কিন্তু সেই সোনাঝরা দিনগুলোর কথা ভীষণ মনে পড়ে।

পত্র পড়ে আমার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল

আমি জ্ঞানে এসেছি খুব বেশি দিন হয়নি, বড়জোর দেড়-দু'মাস হবে। বাবার পত্র এসেছে । লাল কালিতে সিন্ধি ভাষায় লেখা। আমি সিন্ধি পড়তে পারতাম কারণ উর্দু জানতাম। উর্দু এবং সিন্ধির লিপি একরকম। সামান্য পরিশ্রম করেই সিন্ধি ভাষা আয়ত্ত করা যায়। পত্রে বাবা লিখেছিলেন, বাছা, এই বুড়ো বাপকে সহযোগ দেবে না? নতুন সৃষ্টি স্থাপনে এই বুড়োবাপকে সহযোগিতা করবে না? পড়ে আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। একটা ঝটকা লাগল আমার, কে একথা বলছেন? সৃষ্টির আদি পিতা, যাঁর মধ্যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান শিববাবা অবতরণ করেন। দুজনেই করণ-করাবনহার, তাঁদের সামনে আমি মানুষ কে? আমি আপনাদের সত্যি বলছি, আমি 'যোগ' করা সবে শিখছিলাম। বাবার চিঠি পড়ার সময় যোগেই ছিলাম। ভীষণ হালকা ছিলাম, দাঁড়িয়ে ছিলাম না বসে ছিলাম, হাতে আমার চিঠি ছিল কী ছিল না তা আমার হুঁশ ছিল না। আমি অনুভব করছিলাম আমি এক আলোকের মধ্যে অবস্থান করছি। কে বলছেন! কী বলছেন! কী দারুণ নম্র! সৃষ্টি স্থাপনের জন্য কীভাবে কাকে নিমিত্ত করেন ওই সময় আমি খুব বেশি বুঝিনি, কিন্তু আজ যে এত ভাবতে পারছি তা সবই পরবর্তী কালের চিন্তার ফসল। কিন্তু পড়তে পড়তে অনুভব হয়েছিল আমি 'লাইট-স্বরূপ' এবং লাইটের মধ্যেই অবস্থান করছি। প্রথম দিকে যোগ অভ্যাসের কোন কমেন্ট্রি ছিল না। যোগের জন্য এখনকার মতন বিধিপূর্বক এক সপ্তাহ, দশ দিন, বার দিন বিশেষ চর্চার ব্যবস্থা ছিল না। বাবার স্নেহ, বাবার পরিচয় এমন ছিল স্বতঃই অনুভব হত - আমি তো দেহ থেকে পৃথক, যোগেই আছি, আনন্দ ও শান্তির মধ্যে ডুবে আছি, এই সংসার আমার আড়ালে চলে গেছে, আমি কোন নতুন দুনিয়ায়, আলোর দুনিয়ায় আছি।

> *পত্রে বাবা লিখেছিলেন, বাছা, এই বুড়ো বাপকে সহযোগ দেবে না? নতুন সৃষ্টি স্থাপনে এই বুড়োবাপকে সহযোগিতা করবে না?*

নারায়ণের থেকে বড় কে?

মনে পড়ে, বাবা ক্লাসে এসেছেন, বাচ্চাদের কাছে বাবা প্রশ্ন রেখেছেন, আমাদের লক্ষ্য কী? বাবা আমাদের কত উঁচু পদ দেন? এর চেয়ে কি আর কোন উঁচু পদ হতে পারে? ক্লাসে এক ভাই বসেছিলেন। তিনি বাবার দূর সম্বন্ধের পৌত্র। রঙ্গরসিকতা করতে বেশ পছন্দ করতেন। বাবাকে লৌকিক দাদু মনে করে খুব ভালোবাসতেন। বাবা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, বাছা, তোমার কিছু বলার আছে? তিনি বললেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের চেয়েও বড় কেউ আছেন। বাবা সহাস্যে বললেন, আচ্ছা! তিনি কে? ওই ভাই বললেন, দেখুন, যে নারায়ণ, তিনি তো চুল কাটান, চুল কাটাতে তাঁর তো মাথা ঝোঁকাতে হয় নাপিতের কাছে। সুতরাং নাপিত-ই তো বড় হলেন যার কাছে নারায়ণেরও মাথা নীচু করতে হয়। অতএব আমি নাপিত হব। নাপিত নারায়ণের চেয়েও বড়। নারায়ণকে মাথা নাপিতের সামনে ঝোঁকাতেই হবে। ক্লাসে হাসির রোল উঠল। বাবাও হাসতে লাগলেন। বাবা আমাদের বাচ্চাদের হাসতে এবং হাসাতে জ্ঞান দিতেন। ওই সব দিনগুলো কত অনুপম রোমান্টিক ছিল।

কোন ডাক্তারের কথা শুনব?

একবার বাবার সুগারের মাত্রা বেশ বেড়ে গিয়েছিল সাথে ব্লাডপ্রেসারও ছিল। ডাক্তার

বললেন, বাবা ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ওঠেন, দিনে বিশ্রাম করেন না। আপনারা ওনাকে বিশ্রাম করতে দিন এবং নিজেকে বিশ্রাম নিতে বলুন। মনে পড়ে, ওই সময় আমি মধুবনে ছিলাম। দিদি মনমোহিনী দু-চার জন ভাইবোনকে সাথে নিয়ে বাবার কাছ গেলেন এবং বললেন, বাবা আপনি অমৃতবেলায় যোগে আসবেন না। আপনি অনেক রাত্রে ঘুমান আর বিশ্বসেবার কথা ভাবেন। যখনি আপনার ঘরে আসি দেখি, আপনি জেগে রয়েছেন। দিন-রাত যোগে মগ্ন থাকেন। এজন্য অন্তত কিছুদিনের জন্য দয়া করে অমৃতবেলায় যোগে আসা থেকে বিরত থাকুন। বাবা বললেন, কী বলছ? অমৃতবেলায় উঠব না! এটা কী করে সম্ভব? সর্বশক্তিমান বাবা আমার জন্য সময় দিয়ে রেখেছেন, তাঁকে কীভাবে অমান্য করব? সব ভাইবোনেরা খুব করে অনুনয়-বিনয় করে বাবাকে বললেন, বাবা, ডাক্তার বলেছেন আপনার বিশ্রাম নেওয়া খুব জরুরি। বাবা বললেন, বেটি, কোন ডাক্তারের কথা মানি বল তো? এক ডাক্তার বলছেন অমৃতবেলায় বিশ্রাম করো আর সুপ্রিম ডাক্তার বলছেন, অমৃতবেলায় উঠে আমাকে স্মরণ করো। আমি কার কথা শুনব? আমাকে সুপ্রিম ডাক্তারের কথা মানতে হবে না! এজন্যই অমৃতবেলায় আমি বিশ্রাম নিতে পারি না। এরকম বলে বাবা ভাইবোনদের আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু দিদি নাছোড়বান্দা। তিনি বাবাকে বললেন - বাবা, ডাক্তার খুব করে বলে গেছেন, অন্তত দু-তিন দিন আপনি আসা বন্ধ রাখুন। আমাদের কথা আপনাকে মানতেই হবে। দারুণ জিদ করে দিদি বললেন। এরপর বাবা বললেন, আচ্ছা বেটি, ভেবে দেখছি। প্রত্যহ নিয়মানুযায়ী পরের দিন আমরা অমৃতবেলায় যোগে গিয়ে বসেছি। বাবাও চুপিসারে পা টিপে টিপে এসে নিশ্চুপে এসে যোগে বসে গেছেন। এই হলেন আমাদের মিঠা ব্রহ্মাবাবা, শিববাবার আদেশ সদা শিরোধার্য করা বাধ্যের বাচ্চা। যিনি সারাজীবনে একদিনের জন্যও অমৃতবেলা বর্জন করেননি। রোগ-ব্যাধি কিংবা বয়সের ভার ব্রহ্মাবাবার সাধনার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাবা বললেন, বেটি, কোন ডাক্তারের কথা মানি বল তো? এক ডাক্তার বলছেন অমৃতবেলায় বিশ্রাম করো আর সুপ্রিম ডাক্তার বলছেন, অমৃতবেলায় উঠে আমাকে স্মরণ করো। আমি কার কথা শুনব? আমাকে সুপ্রিম ডাক্তারের কথা মানতে হবে না!

যদি আমি নিজের কাহিনি শোনাই, বলব হায়দরাবাদে আমি গেছিলাম

ওই সময় কত আর সেবাকেন্দ্র ছিল! বড়জোর ১০-১৫টি হবে। আমি যখন জ্ঞানে আসি তখন দিল্লি আর কমলানগর ছাড়া আর কোন সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। বিশ্বের প্রথম সেবাকেন্দ্র ওই কমলানগর। আমি ওখানেই থাকতাম। আমার সাথে দাদি জানকী, মনোহর দাদি, দিদি মনমোহিনী সহ পুরনো বোনেরা এবং অন্যান্য দাদিরা থাকতেন। ছোট্ট জায়গা কিন্তু আমরা একসাথে থাকতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম, সবাই মিলেমিশে সেবা করতাম। কী দারুণ সব দিন ছিল। ওই সময় থেকে দাদিদের সাথে আমার সম্বন্ধ তৈরি হয়। ১৯৫১ সালে সেবা শুরু হয়ে যায়। আমি ১৯৫২ সালে এসেছি। আমরা প্রায় একই সঙ্গে সেবা শুরু করেছিলাম। আমার সব কাহিনি যদি শোনাই তাহলে বলব, আমি করাচী এবং হায়দরাবাদেও গেছি। আমি তখন কলেজের ছাত্র, মনে আসত, হে ভগবান, আপনার সাথে আমার কবে মিলন হবে? মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার অনুভব হত কোন এক ঘরে আমি বন্দি। এই সংসারে কেউ আমাকে জেলে আটকে রেখেছে। কেউ আমাকে মুক্তি দিচ্ছে না, কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করছে না। দফায় দফায় একা-একা কাঁদতুম।

নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখো তাহলে তুচ্ছ বিষয়ে সময় ব্যয় হবে না

একবার আকুল হয়ে কেঁদেছি। ওই সময় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কে যেন নির্দেশ দিচ্ছে হায়দরাবাদ সিন্ধের দিকে যাও, করাচীর দিকে যাও। আমিও সেই নির্দেশে সাড়া দিয়ে চলতে শুরু করলাম। সেখানে সাদা কাপড় পরিহিতা বোনেদের দেখলাম। দেখলাম সিন্ধি বোনেদের পাজামা ও কুর্তা পরিহিতা। একটা বিশেষ ঝলক দেখলাম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কেউ তো আমাকে কিছু বুঝিয়ে দেয়নি। কিন্তু এটা ছিল একটা টাচিং। ওই টাচিং-এর জন্যই আমি সেখানে গেছিলাম। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে তিন-চার দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। উদ্দেশ্য - ভগবানের সাথে আমাকে মিলতেই হবে। এদিকে বাড়ির লোকজন আমাকে খুঁজতেই থাকে। ওখানে গিয়ে আমি কিছুই পাইনি। এদিক-সেদিক দেখে বাড়ি ফিরে এসেছি। বাড়িতে এসে কিছু রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা পড়েছি। সেখানে জানতে পারলাম সিন্ধে ওম্ মণ্ডলী ছিল, সরকার ওম্ মণ্ডলী নিয়ে এটা-ওটা করেছে। আমি মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলাম, ওম্ মণ্ডলী আসলে কী? সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছিল? কেন নিয়েছিল? না কারো কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই। যা হোক, যা হয়েছে মঙ্গল হয়েছে। সে এক দীর্ঘ কাহিনি। এর পরে আমি নিজেই জ্ঞানমার্গের পথিক হয়ে গেলাম!

স্নেহবল

কোন এক মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে কোন এক শহরে থাকেন। মাঝে-মধ্যে তিনি গ্রামের বাড়িতে আসেন। মহিলা গ্রামের বাড়িতে একাই থাকেন। স্বভাবে তিনি দারুণ স্নেহময়ী ও উদার। প্রতিবেশীরা সবসময় তাকে সহযেগিতার হাত বাড়িয়ে রাখে, কখনো কেউ তার কাছে দুঃখ পান না। বেশির ভাগ সময় এই মহিলা একাই থাকেন। এক চোর বহুদিন যাবৎ বিষয়টা লক্ষ্য করেছে। সুযোগ মত একদিন ওই মহিলার ঘরে চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকে ছুরি বের করে মহিলাকে বলল, যদি চিৎকার-চেঁচামেচি করো তো প্রাণে মেরে ফেলব। ভালো হবে যদি চুপ থাক এবং আমার যা নেওয়ার তা যদি নিতে দাও। মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি করল না কিংবা ঘাবড়ালো না। খুব শান্তচিত্তে চোরের কথা শুনল এবং বলল, আমি সোরগোল করব না। ভাই, তুমি চুরি করার জন্য আমরা ঘরে এসেছো, এর অর্থ হল - এসব জিনিসপত্রের আমার চেয়ে তোমার বেশি প্রয়োজন। তোমার যা চাই তুমি ইচ্ছেমতো নিয়ে যাও। তোমাকে বরং আমি সাহায্য করি। আমার যদি এসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় তাহলে ভগবান অবশ্যই তার ব্যবস্থা করবেন। মহিলার ব্যবহার এবং তার কথায় চোর হতভম্ব হয়ে গেল। বিগলিত হল তার হৃদয়। হাত থেকে ছুরি মাটিতে পড়ে গেল। সজল নেত্রে বাকরহিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ওই মহিলা একটি চিঠি পেল। চিঠিতে লেখা, দিদি, আমি চোর, পাপী। আমি এই পর্যন্ত মানুষের ঘৃণা আর গালিই পেয়েছি। যা আমার হৃদয়কে পাষাণ করেছে। কিন্তু তুমিই প্রথম, যে আমাকে স্নেহ দিয়েছে, যা আমার জীবন-পথ পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। আজ থেকে আমি চুরি ছেড়ে দিলাম।

স্নেহের সরসতা পাপকর্মকে বিনাশ করে দেয়। স্নেহে জটিল কাজও সরল হয়ে যায়।

স্ব-উন্নতি ও সেবায় সফলতার জন্য বাপদাদার শ্রীমৎ

(অব্যক্ত মুরলী ২০-০৩-১২)

সন্তুষ্টতার শক্তি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, ইহার মধ্যেই সর্বপ্রাপ্তি লুক্কায়িত। সন্তুষ্টতার মধ্যে সর্বশক্তি সম্পৃক্ত। সন্তুষ্টতার স্পন্দন চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করে। সন্তুষ্টমণি আত্মা মায়া কিংবা প্রকৃতির বিচিত্র রঙ্গতামাশা এমন অনুভব করেন, তার মনে হবে কার্টুন-শো দেখছেন।

বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে সন্তুষ্টতার শক্তিতে সম্পন্ন সন্তুষ্টমণি রূপে দেখতে চান। 'কখনো কখনো' সন্তুষ্ট বাপদাদার ভালো লাগে না। যে কোন ধরনের বিপত্তি হঠাৎ-ই আসবে, তাকে মোকাবিলার জন্য কখনো কখনো-র সংস্কার পরিবর্তন করো তাহলেই সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হবে।

বাপদাদা প্রত্যেক সন্তানকে মালার বিজয়ী রত্নে পরিণত করতে চান। সম্পন্ন হও, বিজয়ী হও, ১০৮-এর মালার দানার মধ্যে আরো দানা বাবা জুড়ে দেবেন। যদি তুমি সম্পন্ন হয়েই যাও - তো বাবা তোমাকে নম্বর দিয়ে দেবেন। কারণ, প্রতিটি সন্তানের প্রতি বাবার অপার স্নেহ।

ব্রহ্মাবাবা নিপুণভাবে শ্রীমৎ-এর হাতের সাথে হাত মিলিয়ে ফরিস্তা হয়েছেন। শ্রীমৎ-এর প্রতিটি বিষয় তিনি পরিষ্কার করে পালন করে দেখিয়েছেন। নিজের বুদ্ধিতে ব্রহ্মাবাবাকে সামনে রাখো এবং তাঁকে অনুসরণ করো। ব্রহ্মাবাবার চরিত্র তো সবই জানো, তাঁর '৮ কদম' তো পড়ছ, অতএব তা অনুসরণ করো এবং ব্রহ্মাবাপ সমান হয়ে যাও।

তুমি বুঝছ যে ইহা ভালো না, খারাপ করছে। যখন খারাপ-ই বুঝছ তখন বুদ্ধির মধ্যে তা কেন রাখছ? নিজের হৃদয়ে সদা বাবাকে রাখো তো বাপ সমান হয়ে যাবে। বাপদাদা প্রত্যেকটি বাচ্চাকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন আত্মা দেখতে চান।

বাপদাদা আশা রাখেন, প্রতিটি সেন্টার সংবাদ দিক আমাদের সেন্টার নির্বিঘ্ন, এক তাল ও এক সুরের, বাবার সব সন্তানরা একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ও ব্যস্ত, সর্বোপরি, নির্বিঘ্ন। নির্বিঘ্ন হওয়ার জন্য সামান্য পুরুষার্থ করো দেখবে তোমার জড় চিত্রকে ভক্তগণ যে শুভ ভাবনা নিয়ে দেখে ঠিক সেভাবে তোমায় চৈতন্য রূপে, দেবী-দেবতার রূপে দেখবে।

'প্রভুবার্তা'-য় প্রকাশের জন্য আপনার লেখা (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রের নিমিত্ত শিক্ষিকার সম্মতিসূচক স্বাক্ষরসহ পত্রিকার দপ্তরে পাঠান - সম্পাদক

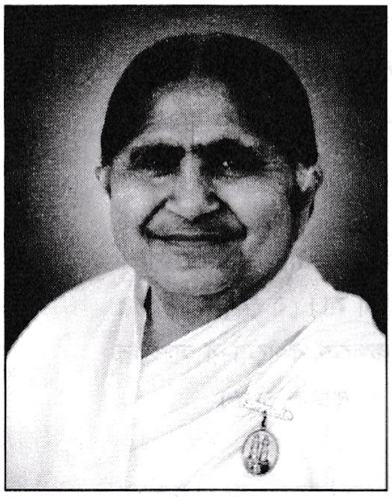

প্রশ্ন আমাদের উত্তর দাদিজির

প্রশ্ন ঃ সূক্ষ্মপাপ কীভাবে তৈরি হয়?

উত্তর ঃ কারো জন্য চিন্তা করে নেওয়া কী, এ যেমন ছিল তেমনই আছে, এ কোনদিনও পাল্টাবে না। এরকম চিন্তা অন্যকে শোনালে ভীষণ সূক্ষ্ম পাপ হয়। এর ফলে অনেক সাজা ভোগ করতে হয়। কর্মের গহন গতির জ্ঞান পাওয়ার পরও যদি কেউ এমন ভুল করে তাহলে তাকে অনেক বেশি সাজা ভোগ করতে হয়।

প্রথমে বাবা বলতেন, বেটি, একে অপরকে সাবধান করে উন্নতি করো। কিন্তু একে অপরকে কে সাবধান করবে? কিন্তু আমি বলি একে অপরের থেকে সাবধান থেকে উন্নতি করো। সাবধান থাকার অর্থ হল নিজের উপর নজর রাখা। এখনো পর্যন্ত কতখানি 'হচ্ছে-হবে' এই মানসিকতা নিয়ে আছ? দুশ্চিন্তামুক্ত থাক কিন্তু হচ্ছে-হবে এরকম গা-আলগা ভাব নিয়ে থেকো না। গাফিলতির কারণে কিন্তু সময়ের মূল্য দেওয়া হয়না। বাবা যা দিচ্ছেন তার কি মূল্য নেই? নিজেকে আধারমূর্ত, উদ্ধারমূর্ত করে সময়কে সফল না করে কারো জন্য সূক্ষ্ম পাপের আধার হয়ো না।

প্রশ্ন ঃ মায়া কার কাছে আসে?

উত্তর ঃ মায়া তার কাছেই আসে যার আসক্তি আছে। গীতাতে আছে অনাসক্ত বৃত্তি হল 'নষ্টমোহ'। বাবার যে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা, 'জ্ঞানী-তু-আত্মা', সে সময় অনুযায়ী জ্ঞানকে ব্যবহার করে। সে নিরন্তর যোগী, বাপ সমান হবার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। জ্ঞানী-তু-আত্মা হল প্রথম, যার মধ্যে বাবার জ্ঞান ভর্তি। অজ্ঞান ও জ্ঞানের মধ্যে বিস্তর ফারাক। অজ্ঞান হল অন্ধকার এবং জ্ঞান হল আলো। বাবা যেমন বলেন না, জ্ঞানসূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ। সূর্যের কিরণ ওয়ান্ডারফুল। একাধারে আলোর কাজ করে, অপরদিকে শক্তির কাজ করে। আলোতে অন্ধকার দূর করে আর শক্তিতে নোংরা আবর্জনা ভস্ম করে। ঠিক ওরকম জ্ঞানসূর্যের আলোতে আত্মা আলোকিত হয়। বাবা জ্ঞানসূর্য আবার জ্ঞানসাগরও। জ্ঞানসূর্য বললে বুদ্ধি ওপরে চলে যায়। আর জ্ঞানসাগর বললে ভিতরের গভীরে চলে যায়। সারাদিন তাই, হয় ওপরে যাও নাহলে জ্ঞানের গভীরে যাও। সাগর কত সুন্দর। তীরে গিয়ে বস, মনে হবে বসেই থাকি। সন্ধ্যাবেলায় সাগরের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর লাগে। অবিশ্রান্ত মধুর ঊর্মিমালা এসে তীরে আছড়ে পড়ে। সমাজ-সংসার থেকে সাগর কতদূরে। বড় শীতলতা দান করে। সাগরে কড়ি পাওয়া যায়, আবার শঙ্খও পাওয়া যায়। শঙ্খ সাগরেরই রচনা। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হল পদ্মফুল সমান থাকা এবং শঙ্খধ্বনি করা। জ্ঞানসাগরের গভীরে যাও, রত্ন পাবে, শীতলতা পাবে। অতএব কামাই আর কামাই।

প্রশ্ন ঃ অন্যেরা আমার কথা মানবে, এর যুক্তি কী?

উত্তর ঃ বাবাকে এত ভালো লাগে কেন? বাবা যখন এত ভালো তখন আমিও ভালো হব। কোথায় বাবা আর আমি কোথায়, তাহলে ভালো হতে গেলে আমাকে কী করতে হবে? প্রথম কর্তব্য হল বাবা যা বলেছেন তা আমাকেই করতে হবে, অন্যেরা করুক বা না করুক আমি দেখব না। এক্ষেত্রে আমিই প্রথম। এমনিতে বলা হয় না, আপনিই প্রথমে কিন্তু এখানে আমিই প্রথম। যদি বলা হয় তুমি আগে করো তাহলে সে মানবে না। আমি করলে সে মানবে। করার কথা

বললে সে করবে না। প্রথমে আমি করলে সকলে তা মেনে নেবে। কারণ, আমার প্রিয় বাবা, মিঠা বাবা সামনে বসে আছেন। এখন যদি তৈরি না হই তো কবে তৈরি হব?

প্রশ্ন ঃ সংস্কার তৈরির জন্য কী করা প্রয়োজন?

উত্তর ঃ সংস্কার পরিবর্তনের জন্য অন্তরের গভীরে যেতে হবে। যার পরিবর্তন হওয়ার সে তো হয়েই যাবে, কিন্তু আমার পরিবর্তন হওয়া চাই। লোহা থেকে শুধু 'সোনা' হলে হবে না, 'পরশমানিক' হতে হবে। লোহা থেকে সোনা করা এতো ভগবানের কাজ। লোহা থেকে সোনায় রূপান্তর হতে হলে খাদকে বের করতে হয়। এর জন্য চাই ঈশ্বর স্মরণ। সংস্কারে যদি সামান্যতমও খাদ থাকে তাহলে তা প্রসঙ্গে আসবে। এই প্রসঙ্গ কেউ আমাকে বলুক কিংবা আমি কাউকে বলি এটা যেন না হয়। পুরুষার্থ তো ভালোভাবেই করছি কিন্তু ঘাটতি থাকছে। তাহলে সম্পূর্ণতার 'হার' কার গলায় পড়বে? যে সম্পূর্ণ হয়ে বসে আছে তার গলায়। আমাকে সম্পূর্ণতাকে আহ্বান করতে হবে। তার জন্য স্রেফ সত্যতা, নম্রতা, ধৈর্য, মধুরতার মূর্তি হয়ে যাও।

মনের গভীরে কারোর জন্য যেন ঘৃণার নামমাত্র না থাকে। যদি মনের গভীরে কারোর জন্য ঘৃণা থাকে তাহলে সম্পূর্ণতা অনেক দূর হয়ে যাবে। ড্রামা যা হয়ে রয়েছে তা একেবারে সঠিক, বাবা বোঝান কিন্তু কাউকে গ্লানি করেন না। কারোর প্রতি ঘৃণাও রাখেন না তাইতো সবাই বাবাকে ভালোবাসেন। বাবার স্নেহ-প্রেম ছোট্ট বাচ্চারও অনুভব হয়। এরকম মিঠা বাবার পালন এবং শিক্ষার এমনই কামাল যে নতুন-আসা বাচ্চাও খুশির দোলায় দুলতে থাকে। বাবা আশ্বাস দেন, বরদান দেন, বাচ্চা, চিন্তা করো না, হয়ে যাবে, হতে পারে বিলম্বে এসেছো।

স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। জ্ঞানের পরকাষ্ঠা হল পদ্মফুল সমান থাকা এবং শঙ্খধ্বনি করা। জ্ঞানসাগরের গভীরে যাও, রত্ন পাবে, শীতলতা পাবে।

প্রশ্ন ঃ সতোগুণীর লক্ষণ কী?

উত্তর ঃ যার রাজ্যপদ নেওয়ার হবে সে কখনো নিকৃষ্টের দিকে নজর দেবে না। শুনবে শুধু বাবার আর বাকি এই দুনিয়াকে সে দেখবে না। আমি কতবার আমেরিকায় গেছি কিন্তু আমেরিকা আমি দেখিনি। এটা তো পাঁচ তত্ত্বের সৃষ্টি। তমোপ্রধানে পরিণত হয়েছে। সতোগুণী সবার গুণ দেখে, গুণবান হয়, গুণদান করে। কারোর অবগুণ দেখে না। সতোগুণীর চোখে অবগুণ ধরাই পড়েনা। বাবা তাঁর নিজের গুণ ধারণ করানোর জন্য বাচ্চাদের শক্তি দেন। ঈশ্বরের যে গুণ ও মহিমা আছে আমরা বাচ্চারা তা ধারণ করি বলেই ঈশ্বরের এত মহিমা। আমরা বাচ্চারা বাবার মহিমা জানি। আমরা এখন বুঝি, আমরা সবাই অতিথি, কারোর সাথে আমাদের বন্ধন নেই। স্মৃতি সবসময় বাবারই থাকে। বাবা যা দিচ্ছেন তা আমাদের জীবনের অঙ্গ হোক। বাবার স্মরণ তখনই আসবে যখন গুণ সেবাতে এবং জীবনে ধারণ করব। ধারণ করার জন্য বাবা বাচ্চাদের বুদ্ধিকে স্বচ্ছ ও শ্রেষ্ঠ করছেন যাতে করে ঈর্ষা, স্বার্থ না জন্মায়। ফলস্বরূপ বাচ্চারা নির্ভীক ও নির্বন্ধন হয়। কাউকে নিয়ে সূক্ষ্ম গ্লানি মনে কিংবা মুখে যেন স্থান না পায়। বাবা বলেন, গ্লানিকারীকে গলায় টেনে নাও। এতটাই বাবা আমাদের বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন আমরা শুধু মহিমা গাইব না, মহিমা যোগ্য হব। আমাদের দেখে সারা দুনিয়া বাবাকে প্রকৃতই চিনতে পারবে।

Meditation হল যোগ অর্থাৎ মিলন। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। এরজন্য প্রয়োজন শান্ত পরিবেশ ও শান্ত ভাব। ইংরেজিতে বলা হয়, 'When mind is silenced God whispers to the ear'-মন শান্ত হলেই ভগবানের কথা শোনা যায়। Meditation হল Silence-এ বসা।

যোগ বা Meditation

-ব্রহ্মাকুমারী এঞ্জেলা

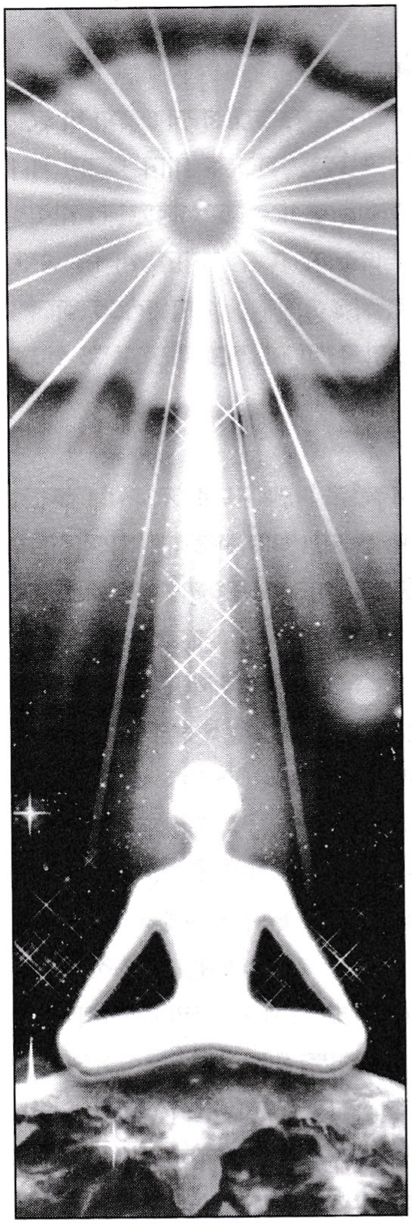

আজকের ব্যস্ততম দুনিয়ায় ঈশ্বর কী বলছেন তা শোনার সময় নেই। কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে দুনিয়ার মানুষের কোন সম্বন্ধ তৈরি হয়নি। যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে তাকেই তো আমরা স্মরণ করি এবং তার কথা শুনি। এরজন্য দরকার ভালোবাসার, ইংরেজিতে Love শব্দটি একটি শক্তিশালী শব্দ। এই শক্তির সঙ্গে অন্য কোন শক্তির তুলনা হয় না। ঈশ্বরকে অন্তর থেকে ভালোবাসা দরকার। লৌকিক জীবনে আমরা যেখানেই যাই আমাদের মা-বাবাকে ভুলি না ঠিক, তেমনি ঈশ্বরের সন্তান বা বাচ্চা হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পুজো বলতে বুঝিয়েছেন উপাসনা অর্থাৎ পুজোর পরিবর্তে হৃদয় দিয়ে তাঁকে পিতা হিসাবে স্মরণ করার কথা বলেছেন। কারণ ভগবান বাচ্চাদের ভালোবাসেন। তার মধ্যে সত্যতা, সততা, সরলতা সব আছে।

Meditation এর এটাই নিয়ম তুমি ভগবানকে যতটা ভালোবাসবে তার থেকেও ভগবান তোমাকে বেশি ভালোবাসবে। খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে ভগবানের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ভগবানকে সাথি বানাতে হবে। ভগবানের সঙ্গে কথা বললে ভগবান উত্তর দেন- সে উত্তর তিনি যে কোন কাজের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেন। গীতায় 'মন্মনা ভব' মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এর অর্থ সকল কাজের মধ্যেও মন ও বুদ্ধির তার ভগবানের সঙ্গে যুক্ত রাখা।

Meditation কানে মন্ত্র দেওয়া নয়। যা শেখানো হয় তাই মুখ দিয়ে বলা জপ। হয়তো কেউ বললেন জিভ উল্টে 'ওম্ নমঃ শিবায়' বল। তুমি জগতে থাকলে কিছু সময় পরে দেখলে মন তোমার অন্য দিকে চলে গিয়েছে। তুমি তখন অন্য কথা ভাবছ। তার মানে গুরুমন্ত্র পেয়েও মন তোমার ঠিক হয়নি, মন একাগ্র হয়নি। Routine মাফিক জপ করা হচ্ছে। মন চায় নতুন খাবার। যেমন প্রতিদিন একই খাবার খেতে আমাদের ভালো লাগে না। তেমনি মনেরও নতুন নতুন ভোজন দরকার। মনের ভোজন জ্ঞান, চিন্তা। কতদিন আমরা জপ করব? জপ করতে করতে মন দুর্বল হয়ে যাবে। মন তখন মুখকে একাজের ভার দিয়ে এধার-ওধার ঘুরে আসবে। সে সময় মনে আসবে কুচিন্তা, ব্যর্থ চিন্তা, নেতিবাচক চিন্তা। তাই Meditation কোন মন্ত্র জপ করতে বলে না। Meditation শেখায় আত্মচিন্তন, জ্ঞানচিন্তন, পরমাত্মচিন্তন। দেখো মন কত খুশি থাকবে। Meditation হল যোগে বসার অভ্যাস, পরমপিতার সঙ্গে বার্তালাপ (conversation), যেমন দৈহিক ব্যায়াম প্রথমে আমাদের ভালো লাগে না। তারপর করতে করতে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়। Meditationও সেরকম আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়। বাইরের কাউকে এরজন্য মনে করতে হয়না ভেতর থেকেই তাগাদা আসে। শরীরের মত মনেরও দরকার ভোজন ও আরাম। মনকে ব্যস্ত রাখতে হবে জ্ঞান ও সুচিন্তার মধ্যে। খারাপ সংবাদ পড়ে সকালেই মন খারাপ করা উচিত নয়। দিন শুরু করতে হবে পরমাত্ম চিন্তনের দ্বারা। দুর্বল পরিবেশ পরিস্থিতি মনকে প্রভাবিত করে

কিন্তু মন ঠিক থাকলে যত খারাপ পরিস্থিতি আসুক সব কাটিয়ে ওঠা যায়। মনেরও rest দরকার। আজকাল আমরা tension, depression ও hyper tension-এ ভুগছি, এর অর্থ মনের স্বাস্থ্য ভাল নয়। Meditation মনের স্বাস্থ্য ভাল করে।

Meditation হল relaxation of mind.রাতে যখন আমরা শুই আমাদের দেহ শোয় কিন্তু মন শোয় না। মন স্বপ্নের রূপে চলে। তাই শোবার আগে Meditation করে শুলে মন আরাম পায় ফলে সুনিদ্রা হয়।

Meditation মনকে দেয় ইতিবাচক (Positive thinking) ফলে মনের মধ্যে আসে will power.ফলে মন ঠিক করে নেয় যে কখনও negative ভাববো না। অর্থাৎ Meditation-এর মধ্যে দিয়ে আসে মানসিক দৃঢ়তা।

Meditation কোন মন্ত্র জপ করতে বলে না। Meditation শেখায় আত্মচিন্তন, জ্ঞানচিন্তন, পরমাত্মচিন্তন।

Meditation মানে চিন্তাশূন্য বা বিচারশূন্য নয়, Meditation-এর মধ্যে দিয়ে মনে আসে উদ্যম (energy) অর্থাৎ Meditation energy tonic-এর কাজ করে, ফলে কোনো প্রকার ক্লান্তি মনে আসে না। যে কোনো সমস্যায় আমরা পরমপিতার সঙ্গে একটা constant relation তৈরি করে নিই, সে মুহূর্তে এই ভাবনা আমরা মনে এনে শান্তি পাই যে, যা করার বাবাই করবেন, জীবনের অঙ্ক তো আমাদের লেখাই আছে। আমরা জানি “What is loted can not be blotted”. এভাবে সবকিছু ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা support পাওয়া যায়। এর ফলে ভেতরের নিশ্চিন্ততার ভাব তৈরি হয়। বর্তমান tension-এর যুগে মানুষের কী ক্ষমতা? প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সমস্যায় ভুগছে। কাজেই tension free হবার জন্য Meditationই আমাদের সুস্থভাবে বাঁচার রাস্তা দেখায়।

Tension সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। Tension এর সূতিকাগৃহ হল মন ও বুদ্ধি। কর্মের জন্য মনে চিন্তার তরঙ্গ ওঠে। ওই চিন্তা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তবে কর্ম হবে কিনা সেই রায় বা সিদ্ধান্ত দেয় বুদ্ধি। মন ও বুদ্ধির তালমিল থাকলে সমস্যার উদ্ভব হয় না। সমস্যা তখনই হয় যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে মন একাধিক চিন্তা করে আর বুদ্ধি সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম হয়। শুরু হয় মন ও বুদ্ধির যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে Tension বলে। Tensionকে দূর করতে চাই Attention। মন যেন নির্দিষ্ট সময়ে মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা না করে সেদিকেই Attention রাখতে হবে। একমাত্র পবিত্র কর্মই পারে মনকে মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা থেকে বিরত রাখতে।

উপসংহারে এসে বলা যায় পুজো বা জপের মধ্যে আছে একঘেয়েমি; এতে আনন্দ অনুভব করা যায় না - ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয় না। কিন্তু Meditation মন্ত্র উচ্চারণ নয়, Meditation একতরফা (one sided) প্রার্থনা নয়, Meditation বিচারশূন্য অবস্থা নয়। Meditation সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর সদর্থক দিশা (positive direction).

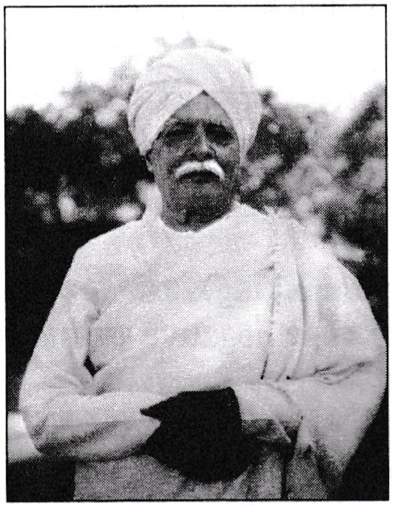

আদিদেব

- ব্রহ্মাকুমার জগদীশচন্দ্র

পারিবারিক প্রতিক্রিয়া

শিববাবার আগমনের পূর্বে, ব্রহ্মাবাবা তাকে এক সমৃদ্ধ সিন্ধি পরিবারে বিবাহ দেন। এখন শিববাবার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বাবার মনে হল, মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তিনি ভুল করেছেন। তিনি অনুভব করলেন মেয়েকে জ্ঞানের পথ দেখানো তার কর্তব্য। এই মেয়ের পরে নাম হয়, ব্রহ্মাকুমারী দাদি নির্মলশান্তা, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন -

আমার বাবা ঈশ্বরের বাহন হওয়ার পূর্বে, তার চালচলন ছিল সত্যিই রাজকীয় এবং তাঁর ভক্তি ছিল খুবই প্রগাঢ়। সুতরাং বাবা আমার বিবাহ এমন একজনের সঙ্গে দিলেন, যে ছিল সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন। সে ছিল শহরমুখী।

আমার শ্বশুরবাড়িতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ঘাটতি ছিলনা। বিবাহের পূর্বে ও আমি যখন বাবার সঙ্গে ছিলাম, তখনও আমি সুখী ও উদ্বেগমুক্ত ছিলাম। বাবা আমাদের কোন কিছুর অভাব বোধ করতে দেননি এবং তিনি আমাদের প্রচুর স্নেহ ও যত্নসহকারে লালন পালন করেছেন। পরবর্তীকালে আমি বুঝতে পারলাম, সেটা কতটা বিশাল ছিল। তথাপি পূজা, প্রার্থনাদির প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিলনা। আমার তো সবই ছিল, তাই আর কী পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করব? কিন্তু, বাবার দেহে শিববাবার প্রবেশে সবকিছুই যেন বদলে গেল। বাবা, আগেকার মতো আমাদের স্নেহ ও যত্ন করেননা। অবশ্য আমি যখন বাবার কাছে গেলাম, আমি বোধ করলাম, বাবা আরও নম্র, ভদ্র ও স্নেহশীল কিন্তু অন্যরকম। এখন ঈশ্বর প্রেমে তিনি আপ্লুত। সমস্ত পৃথিবী এখন তার পরিবার। পূর্বের ন্যায় পিতামাতার সঙ্গে কথা বলতে পারিনা। যে কোন সুযোগে তাঁরা আমায় জ্ঞান শোনান। এসব আমার ছন্নছাড়া মনে হল, কেননা, প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারিনি যে, এ সব চেষ্টা তাঁরা আমার হিতের জন্যই করছেন। এই সুবর্ণ সুযোগ যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য তাঁরা চাইতেন আমি জ্ঞানের পথে চলি। প্রথম দিকে এই সবের সত্যতা আমার কাছে ধরা দেয়নি। আমি দেখলাম তারা যেন একটু অন্যরকম, যেন দূরের মানুষ। তথাপি একদিন, যা কিছু ঘটে চলেছে, তার সত্যতা আমার মনে ছাপ ফেলল।

এক উৎসব পালন করা হচ্ছিল এবং বাবা আমাকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। আমি দেখলাম, বেশ কিছু কন্যা মাতা, মনোযোগ দিয়ে বাবার জ্ঞান শুনছেন এবং অন্যদিকে অন্যরা নৃত্য উপভোগ করছেন। নৃত্যটি সাধারণ ছিলনা। তাদের একাগ্রচিত্ত দেখে, পরীক্ষা করতে তাদের সন্নিকটে গেলাম। প্রথমদিকে এই নৃত্যের ধরণ আমার পছন্দ হয়নি কিন্তু পরে পায়ের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমি তাদের মুখমণ্ডল ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। এবার আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, তাদের মুখমণ্ডলে এই দিব্য আনন্দের দ্যুতি সম্পূর্ণরূপে অপার্থিব যা পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। চারিদিকের পৃথিবী সম্পূর্ণ ভুলে তারা এক আচ্ছন্নের মাঝে আবিষ্ট ছিল। তারা মানস চক্ষে কি দৃশ্য দেখছিল? কিভাবে প্রত্যেকের পায়ের গতিবিধি এমন তালে ও ছন্দে তারা মেলাচ্ছিল? নৃত্য আরও সূক্ষ্মস্তরে হতে লাগল এবং আমার মনে এটা প্রতিভাত হল যে, এই মহিলারা খুবই দক্ষ। বস্তুতঃপক্ষে পেশাদারি নৃত্যশিল্পীরাও এরূপ দক্ষতা ও লাবণ্যময়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে পারত না। তাহলে এখন তারা এত সঠিকভাবে কী করে করতে পারছে? আমি জানতাম, তারা সাধারণ বোধশক্তির মাঝে

নেই, কিন্তু আন্তরিক স্তরে তারা যে সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যে মগ্ন ছিল- এরূপ কোন ধারণা আমার তখনও হয়নি। ওই মুহূর্তে তারা তাদের ভবিষ্যৎ সত্যযুগে বা স্বর্ণযুগে বাস করছিল। ঈশ্বর প্রদত্ত, সত্যযুগ দর্শনের ফলেই তারা এরূপ নৃত্য করতে সক্ষম হল। তাদের চেহারায়, আমি শান্তি, প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগ দেখি। আমি শক্তি, স্নিগ্ধতা এবং পবিত্রতার শক্তিতে উদ্দীপ্ত এক পরিবেশকে অনুভব করলাম।

নৃত্যপর্ব প্রায় যখন শেষ হয়, আমি তাদের একজনকে তার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করলাম যে, সে তখনও সেই বোধে আচ্ছন্ন, আওয়াজের ওপারে এবং উত্তর দেওয়ার জন্য সে ওই স্বর্গের সুখকর স্থান ত্যাগ করতে এখনও রাজী বা সক্ষম নয়। তার কথা বলতে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল। ধীরে এবং খুব নীচু স্বরে, সে আমায় বলল, 'আপনাকে আমি আগামীকাল বলব।' তার উত্তর শোনার জন্য আমার খুবই ইচ্ছা করছিল। সুতরাং আমি বাবাকে একটি গাড়ি পাঠাতে অনুরোধ করলাম এবং তার কাছে যেতে চাই, বললাম। বাবা বললেন,'ঠিক আছে, মা, আগামীকাল আমাদের দেখা হবে।' এই উত্তরে আমি খুশি হলাম না। বললাম,'বাবা, তুমি এমনভাবে কথা বলছ কেন?' বাবা বললেন, 'গাড়ি পাঠাবার কথা ভেবেছি, কিন্তু আগামীকাল কী ঘটে - দেখা যাক।'

আমি বোধ করলাম, বাবা আরও নম্র, ভদ্র ও স্নেহশীল কিন্তু অন্যরকম। এখন ঈশ্বর প্রেমে তিনি আপ্লুত। সমস্ত পৃথিবী এখন তার পরিবার।

আমি অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে লালিত পালিত হয়েছি, তাই বাবার এরূপ কথাবার্তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। পূর্বে বাবা কখনও আমার সঙ্গে এরূপ হেঁয়ালিপূর্ণ কথা কখনও বলেননি এবং অজ্ঞানতাবশতঃ আমি তাকে অপমান বলে মনে করলাম। পূর্বে আমি যদি বাবাকে স্বর্গ থেকে তারা নিয়ে আসতে বলতাম, বাবা তা অবশ্যই করতেন। এখন তিনি আমার জন্য গাড়ি পাঠাতেও ইতস্ততঃ করছেন। আমি রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু বাবা আমাকে অনুসরণ করলেন, গাড়িতে বসালেন এবং আমার শ্বশুরবাড়িতে নিরাপদে পৌঁছালেন। আমি ভাবলাম বাবা আমার মানভঞ্জনের চেষ্টা করছেন। আমি গাড়ি থেকে নেমে একটু উষ্মা নিয়ে বললাম, 'আগামীকাল গাড়ি না পাঠালে আমি যাব না।' আমার এখনও স্মরণে আছে বাবা তখন কি বলেছিলেন। মৃদু হেসে বাবা বললেন,'মা, তুমি কি জান কাল কী হতে যাচ্ছে?' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম,' যা ঘটবার, সেটা কাল দেখা যাবে।' ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুয়ে পড়ি, কিন্তু রাতে দুই বা আড়াই ঘটিকার সময় আমি হঠাৎ উঠে পড়লাম। ঘরটি এক অপার্থিব আলোয় প্লাবিত। আমি জানতাম, কোন বস্তুর উৎস থেকে এই আলো আসছে না। আলোর প্রভার মাঝে দেখলাম, বাবা। প্রথমে আমি যা দেখলাম, তা বিশ্বাস করতে পারিনি। যখন দৃশ্য ফিকে হয়ে গেল, আমি চোখ বুজলাম এবং ঘুমাবার চেষ্টা করলাম, আমি নিজেকে বোঝালাম বাবার সঙ্গে গতকাল বিকেলে আমার কথোপকথন হয়েছে, সেটাই স্বপ্ন হয়ে আমার মানসপটে উদয় হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সেই দিব্য আলো পুনরায় সারা ঘরকে প্লাবিত করল। এটা অবিশ্বাস্য। আমি জোর করে আবার শোবার চেষ্টা করলাম। আমি আর ওই বিষয়ে চিন্তা করতে পারছিলাম না। কিন্তু সত্য থেকে তো পালাবার উপায় নেই । কেননা, তৃতীয়বারের জন্য বাবা আবির্ভূত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে দণ্ডায়মান। এক অনাস্বাদিত মিষ্টিমধুর স্বরে এক আহ্বান শুনলাম, 'মা, জাগো, বিশ্বের উন্নতির জন্য তোমায় কাজ করতে হবে।'

(ক্রমশঃ)

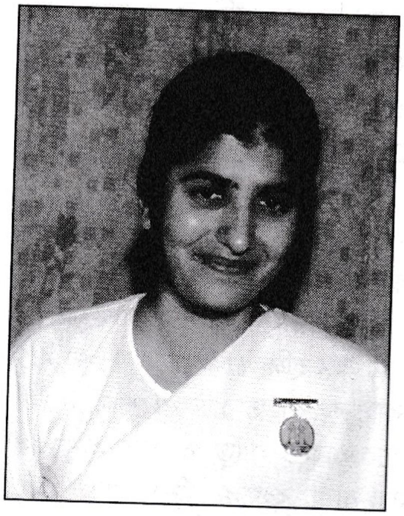

খুশির উৎস সফলতা

- *ব্রহ্মাকুমারী শিবানী*

প্রশ্ন ঃ দেখা যায় রাগ করলে কাজ হয়ে যায়, তাহলে রাগ করা কী জরুরি ?

উত্তর ঃ নিজের জীবনপথে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে দেখা প্রয়োজন - জীবনে কী চাই; শুধু কি কাজ করানোই মূল উদ্দেশ্য? মনে করো, 'মন' হল অপারেটিং সিস্টেম। রাগ করে কাজ তো হাসিল হল অন্যদিকে খুশি তো হারিয়ে গেল। আমার নীট ফল তো অন্য কিছু চাই। নীট ফলে খুশি তো এলো না। বারবার রাগ করলে তার উৎপাদিত ফল খুশি কিছুতেই আসতে পারে না। সুতরাং আমার কাঙ্ক্ষিত ফল খুশি না পেলে আমার অপারেটিং সিস্টেমকে চেক করা দরকার। কারণ চাইছি এক, ভরছি আর এক, আর ফল আশা করছি আর এক। আমি করছি রাগ আর আশা করছি খুশি। খুশি কোথা থেকে আসবে? আপনি রাগ করে কেন কাজ করিয়ে নিচ্ছেন? আপনার চাইতো খুশি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে। যত কাজ করানো যাবে ততই সফলতা পাওয়া যাবে ততই খুশি আসবে। এরকম বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সারাদিন কত যে কাজ করে চলেছি তার ইয়ত্তা নেই। যে গুণগত মানের উপর পদ্ধতি তৈরি করবেন তার উপর ভিত্তি করেই বিশ্বাস দাঁড়াবে।

প্রশ্ন ঃ আমার মান্যতা সঠিক না ভুল তা কীভাবে পরখ করব ?

উত্তর ঃ একটা বিষয় ভালো করে দেখতে হবে, এক হল আমার মান্যতা অপরটি হল সত্যতা। রাগ করা প্রকৃতিগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এটা এক বিশ্বাস না সত্য তা নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখতে হবে। যদি আমি একই ভুল মান্যতা নিয়ে জীবনে চলতে থাকি তাহলে দেখতে হবে কেমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়? বিশ্বাস থেকে চিন্তার জন্ম হয়, চিন্তা থেকে ভাগ্য তৈরি হয়। আমার একটি বিশ্বাসের ভিত্তিও যদি টালমাটাল হয় তাহলে তার প্রভাব কীসের উপর পড়বে? আমার ভাগ্যের উপর। এজন্য ক্ষণিকের জন্য ভাবুন এবং আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিকে চেক করুন। সারাদিনে আপনি যে এনার্জি ব্যয় করছেন, আপনার সাথে যা হয়ে চলেছে, সব মিলিয়ে ভিতরে ভিতরে আপনি বিরক্ত বোধ করছেন না তো? যদি করেন তাহলে ভালোভাবে ভেবে দেখুন আপনার কোন বিশ্বাসের ভিত্তি কাজ করছে? ওই সময়ে আপনার বিশ্বাসের রকমকে চেক করতে পারবেন। চেক করে আপনার জীবনে তার সমীকরণ করে রাখুন। মান্যতা থেকে সংকল্প এবং সংকল্প থেকে ভাগ্য নির্মিত হয়। ধরা যাক্, আমরা দুজনে বসে আছি, আমাদের সামনে চারজন আসছে। ওই চার জন আমার সাথে কথা না বলে আমার সাথির সাথে কথা বলছে। ওই সময় আমার ভালো লাগছে না। ওই মুহূর্তে আমার ভিতরে কোন চিন্তার উদয় হয়? আমার কোন বিশ্বাস কাজ করে? ওই সময় আমার মধ্যে চিন্তার উদয় হয় আমার সাথিটি আমার চেয়ে ভালো। মানুষ ওকেই চায়। এই চিন্তার জন্য আমার অপমান বোধ জাগ্রত হয়। এবিষয়ে আমার এই বিশ্বাস বোধ কাজ করে - প্রশংসা তারই হয় যে ভালো মানুষ। এক্ষেত্রে প্রশংসাকে আমরা আধার বানিয়ে ফেলি। বিশ্বাসের ভিত্তি অতি সত্ত্বর কী সিদ্ধান্ত দিল? আমি ওই মানুষটির মত অত ভালো নই, যদি ভালো হতাম তাহলে আমাকেও ওই চারজন সম্মান দিত। এর পরের ধাপ হল ভিতরে ভিতরে ওই ব্যক্তির উপর ঈর্ষার ভাব জন্ম নেওয়া।

পেশার প্রসঙ্গ ও বাবার শিক্ষা

- ব্রহ্মাকুমার শিবু, কলকাতা

যোগীজীবন মানেই বাপদাদার সাথে অবিচ্ছেদ্য যোগ। আলাদা করে পরিপাটি হয়ে আনুষ্ঠানিক স্মরণ করার প্রয়োজন হয়না। তবুও জানুয়ারি মাস এলেই ব্রহ্মাবাবার সীমাহীন মহিমাযোগ্য কর্মের স্মৃতি আমাদের প্রাণিত করে। দৈনন্দিন জীবনে তাঁর অসংখ্য মহিমাযুক্ত কর্ম সেই মহান ভাগ্যবানেরা দেখেছেন যাঁরা তাঁর দুর্লভ সাকার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বরিষ্ঠ ভাইয়েরা, দিদিরা এবং দাদিরা সেই দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী। বর্তমানে আমরাও দারুণ ভাগ্যশালী এজন্য যে বাপদাদার অব্যক্ত সান্নিধ্যের পালনায় আছি। সাকারের সব ঘটনা যে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা নয় তবুও যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার দ্বারাও আমরা অভাবনীয় সমৃদ্ধ হচ্ছি। বাপদাদা চেয়েছেন প্রতিটি সন্তান তাঁর মত হোক। এজন্য বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে খুব হালকা ছলে, সরস বাক্যালাপে খুব কঠিন গুহ্য রহস্য জলের মত তরল করে বাচ্চাদের সামনে তুলে ধরতেন। বাচ্চারাও অতি উৎসাহে আকণ্ঠ পান করে পুষ্টি লাভ করেছে। আত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে বাবার ওই শিক্ষা আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। যা এক ঝটকায় অজ্ঞানতা, দুর্বলতা ও অলসতা দূর করে বিবেকের উদয় ঘটায়। বহু পেশার প্রসঙ্গ টেনে বাবা বাচ্চাদের জ্ঞানধারণা করাতে কতখানি জাদুকরি দেখিয়েছেন তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখব।

উকিল বা ব্যারিস্টার ঃ বাবা বলেন, ফৌজদারি আদালতে এমন মামলা হয় যার অন্তিম পরিণতি অভিযুক্ত ব্যক্তির আজীবন জেল বা মৃত্যুদণ্ড। মক্কেলকে বাঁচাতে এরকম মামলায় আইনজীবী নিজেকে দারুণভাবে তৈরি করে। কোন্ কোন্ পয়েন্ট নোট করতে হবে, কোন্ কোন্ ধারা উত্থাপন করতে হবে। সওয়াল জবাবে সতর্ক থাকতে হবে। কোন্ পয়েন্ট আগে আর কোন পয়েন্ট পরে আসবে চিন্তা করে নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী উকিলের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিয়ে বিচারকের মতামত নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। যদি এসবের ব্যতিক্রম হয় বা ভুল হয় তাহলে মামলায় হেরে তার মক্কেলের ফাঁসিও হতে পারে।

এরূপ বর্ণনা করে বাবা বলতেন - বাচ্চারা, তোমরাও একপ্রকার উকিল, শিববাবা যে কর্মরহস্যের জ্ঞান দেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে হবে। কোন কর্ম উচিত কোন কর্ম অনুচিত। কোন পাপ কর্মের জন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে, এটা জানা জরুরি। কর্মের জ্ঞানও একপ্রকার আইনের জ্ঞান। এই কর্মের জ্ঞান দ্বারা তুমি নিজেকে এবং অন্যকে শ্রেষ্ঠকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করতে পার। ফলস্বরূপ ধর্মরাজের দণ্ড থেকে, গর্ভ জেল থেকে, যমের ফাঁসি থেকে নিজে বাঁচবে, অন্যকেও বাঁচাতে পারবে। বাবা আরো যোগ করেন - দেখ, দুনিয়ার ব্যারিস্টার বা উকিল একজন্মের জন্য মানুষকে সাজা কিংবা ফাঁসি থেকে বাঁচায় কিন্তু তুমি ২১ জন্মের জন্য শুধু মৃত্যু বা সাজা থেকে বাঁচাও না, তার সাথে সব রকমের দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্ট থেকে মুক্তি দাও, তাও আবার বিনা ফি-তে। অতএব তোমাদের এটা ল-কলেজও বটে; এখানে তোমরা সব আচার-সংহিতা, কর্ম ও তার দণ্ডবিধান এবং জীবনবিধি শিখছ।

ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার ঃ ডাক্তারদের প্রসঙ্গ টেনে বাবা বলেন, অভিজ্ঞ পারদর্শী ডাক্তারের ওষুধের উপর দক্ষতা থাকে, কোন্ রোগীকে, কোন্ ওষুধ দিলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে তা তিনি জানেন। তিনি সফলতাও পান। আবার কোন ডাক্তার যদি সঠিক সময়ে সঠিক ওষুধ না দিতে পারেন তো রোগী মারাও যেতে পারেন। এসব বলে বাবা বোঝান, এসব ডাক্তার তো শরীরের রোগের চিকিৎসা করেন। একবার রোগ সেরে গেলেও আবারও রোগের শিকার হতে পারে। কিন্তু শিববাবা যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান দেন তাকে 'অমৃতধারা' কিংবা 'সঞ্জীবনী বুটি' বলতে পার। এটা এক মহৌষধ। এই ওষুধ সেবনে প্রায় মরে যাওয়া বা নিষ্প্রাণ আত্মা নতুন করে প্রাণ পায়। আর তিনি যে 'ঈশ্বরীয় যোগ' শেখান তা 'ইনজেক্শন'-এর কাজ করে। এই ইনজেক্শনের দ্বারা 'বিকার' রূপী জীবাণুকে ধ্বংস করে আত্মাকে পূর্বের প্রকৃত স্বরূপে ফিরিয়ে আনা হয়। 'যোগ'-কে তোমরা আত্মার 'টনিক'ও বলতে পার আর জ্ঞানের বিভিন্ন পয়েন্টকে হরেক রকম 'ভিটামিন'ও বলতে পার। তাহলে এবার ভাবো তোমার হাতে ওষুধ আছে, ইনজেক্শন আছে, টনিক আছে, ভিটামিন আছে। অতএব তোমরা সকলে ডাক্তার। তোমরা আত্মাতে যে বিকার রূপী রোগ আছে তাকে ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ করার চিকিৎসা করছ, তাও আবার বিনামূল্যে। তোমাদের এই সেবাকেন্দ্র একপ্রকার হাসপাতাল। বর্তমানে সারা দুনিয়া বিকার রূপী রোগে আক্রান্ত। সাধু, সন্ত, গুরু এঁরা কেউই এর বাইরে নন। শিববাবা তোমাদের ডাক্তারি পড়াচ্ছেন সকলের প্রয়োজন মত চিকিৎসা করাতে। বর্তমান পৃথিবী ঘোর সংকটে। আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যতিরেকে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

> *বর্তমানে সারা দুনিয়া বিকার রূপী রোগে আক্রান্ত। সাধু, সন্ত, গুরু এঁরা কেউই এর বাইরে নন। শিববাবা তোমাদের ডাক্তারি পরাচ্ছেন সকলের প্রয়োজন মত চিকিৎসা করাতে। বর্তমান পৃথিবী ঘোর সংকটে। আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যতিরেকে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।*

বাবা রুহানি চিকিৎসকের দক্ষতা সম্বন্ধে বলেছেন - যদি তুমি দক্ষ চিকিৎসক নাও হতে পার কম্পাউন্ডার তো হও। অল্পবুদ্ধি কিংবা কড়া সংস্কারের জন্য হয়তো অনেকে ভালো ডাক্তার নাও হতে পারে কিন্তু কম্পাউন্ডার তো হতে পারে। কম্পাউন্ডারের কাজ তো সবাই জানে। রোগীর ঘায়ে ড্রেসিং করা, মলম লাগানো, কখনো প্রয়োজন মত ব্যান্ডেজ বাঁধা, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ, ইনজেক্শন লিখে দেওয়া বা কখনো কখনো রোগীর উপর তা প্রয়োগ করা। পরিস্থিতি অনুযায়ী ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid) করা, সর্দি, কাশি বা সাধারণ রোগ, জ্বরে ছোট-খাট ওষুধ তো দিতে পারে। সর্বোচ্চ রুহানী ডাক্তার শিববাবা, তাঁর ছাত্র হয়ে এইটুকু তো সবার পক্ষে করা সম্ভব। মানুষ যেন এসে তোমাদের কাছে একটা নিশ্চিন্ত ভরসা পায়।

জীবন বিমা ঃ জীবন বিমা প্রসঙ্গ এনে বাবা বলতেন- যে ব্যক্তি নিজের জীবন বিষয়সম্পত্তির বিমা করেন তিনি সময় অন্তে চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ সহ ফেরত পান। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা বা রোগব্যাধির কারণে চুক্তির সময় পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি তার মৃত্যু হয়, তবুও তার চুক্তির পুরো টাকাই তার উত্তরাধিকারী পেয়ে যায়। বাবা বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেন, ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া মানে 'বিমা' করা। বিমা কোম্পানিতে কোয়ার্টারলি, হাফ-ইয়ারলি, অ্যানুয়ালি বিমার কিস্তি (Premium) জমা করতে হয়। এখানে অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণ নিলে একবার জমা করতে হয়। জমা করার উপায় হল

তনু-মন-ধন সহ ঈশ্বরের হয়ে যাওয়া। এর রিটার্ন হল 'স্বার্গিক সৃষ্টি'-তে দৈবী স্বরাজ্যে জন্মজন্মান্তর ধরে অসীম ধনসম্পত্তি সহ সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকা। এবার ভাবো কোন্ বিমা শ্রেষ্ঠ? দুনিয়ার বিমা ফেল করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের বিমা পূর্ণমাত্রায় সুনিশ্চিত। ঈশ্বরের কাছে যে বিমা করে সে তার 'তুচ্ছ' জিনিস ভগবানকে প্রদান করে তার বিনিময়ে লক্ষগুণ 'আচ্ছা' জিনিস জন্মজন্মান্তর ধরে প্রাপ্ত করে। এর মূল কারণ দুনিয়ার বিমা কোম্পানির নিজের লাভের দিক দেখতে হয়। ভগবানের ক্ষেত্রে তা নয়। তিনি তো সন্তানের লাভের দিকটাই দেখেন। দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মের গ্রহীতা তিনি নন। তিনি সন্তানের দুঃখদায়ী 'বিষয়'গুলো গ্রহণ করে সুখদায়ী 'বিষয় সম্পত্তি' দান করেন। তিনিই প্রকৃত দাতা।

বাবা আরো বলেন, দুনিয়ার বিনাশ নিয়ে সংশয় করো না। বিনাশ অবধারিত। সুতরাং ঈশ্বরীয় বিমা করিয়ে নাও। শরীর কখন ছিন্ন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বলা হয় 'শ্বাসের উপর ভরসা নেই' বিমা করে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখো। মনে রেখ 'সংশয়াত্মাঃ বিনশয়ন্তি'। 'অনেক গেছে অল্পই আছে, শুধু অল্প নয় অতি অল্পই আছে'। অতএব ঈশ্বরীয় বিমা করে নিজের কল্যাণ করো।

ঈশ্বরের কাছে যে বিমা করে সে তার 'তুচ্ছ' জিনিস ভগবানকে প্রদান করে তার বিনিময়ে লক্ষগুণ 'আচ্ছা' জিনিস জন্মজন্মান্তর ধরে প্রাপ্ত করে।

চামার ঃ বাবা বলতেন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সেই মানুষটি চামার যার সমস্ত কারবার চামড়া ঘিরে। চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করা, ব্যাগ, বেল্ট, পার্টস সহ অন্যান্য ব্যবহৃত সামগ্রী তৈরি করা। এছাড়া কাঁচা চামড়া নানা পদ্ধতির মাধ্যমে ধুয়ে, শুকিয়ে, রঙ করে পাকা চামড়াতে পরিণত করাও এদের কাজ। সমাজের একটা বিশাল অংশের মানুষ এদের কাজকে নোংরা ও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। এদের তাই নিম্ন শ্রেণির শূদ্রজাত হিসাবে গণ্য করে। তুমি যদি 'জ্ঞানের দৃষ্টিতে' এই দুনিয়াকে দেখ তাহলে দেখবে দুনিয়ার সবাই আজ 'চামার'। কারণ দুনিয়ার মানুষ স্থূল চোখে একজন আর একজনকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? চামড়ার দৃষ্টিতেই দেখে। কালো না ফর্সা, যুবা-যুবতী না বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সুন্দর না কুৎসিত, নর না নারী। এসবের প্রেক্ষিত বুঝে একে অপরের সাথে ব্যবহার করে। এবার ভাব, যে ব্যক্তি মন-মানসিকতায় 'দেহরূপী' চামড়াকে রেখে সামগ্রিক আচার-ব্যবহার করে তাকে চামার বলবে না কী বলবে? এরাও তো একপ্রকার 'শূদ্র'। এদের ভোগবিলাসের কারবারও তো চামড়া ঘিরেই। চামড়া দিয়ে ঢাকা মানুষের শরীরের দুই ভ্রূকুটি মাঝে বসে থাকা আত্মার উপর কারোর দৃষ্টি পড়ে না। উচ্চবর্ণ কিংবা প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁকেই বলা হবে যে চামড়ার দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে 'আত্মিক' দৃষ্টিতে দেখবে। নকলকে বাদ দিয়ে আসলকে দেখবে। বর্তমান সমটা নকলের রমরমা। তাই ধোঁকার কবলও অহরহ। এসময়ে অবিনাশী প্রকৃত সত্তা আত্মাকে এবং তাঁর অভিনয়কে দেখতে হবে। আত্মা বহন করা চামড়া দিয়ে আবৃত বিনাশী শরীরকে দেখলেই ধোঁকা খেতে হবে। বাবা চান, বর্তমান নকলের মরশুমে প্রত্যেকটি বাচ্চা ধোঁকার কবল থেকে নিজেকে বাঁচাক এবং ভবিষ্যতের জীবন্মুক্তির পদ লাভ করুক।

অপার্থিব রাসলীলা প্রসঙ্গে

ব্রহ্মাকুমার লক্ষ্মীকান্ত
- শ্যামনগর

কয়েকবছর আগের কথা, পরদাদির (রাজযোগিনী দাদি নির্মলাশান্তাজি) জন্মদিনে, তার সাথে রাস করতে করতে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার এক ভাব তরঙ্গে বিমোহিত হলাম। পরদাদির মধ্যে দিয়ে সাকার ব্রহ্মাকে যেন দেখলাম। তাই রাসলীলার প্রসঙ্গ যৎসামান্য পরিবেশন করার চেষ্টা করছি।

ভক্তির সামগ্রীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রসঙ্গ কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন তার রূপরেখায় কত কাহিনি রচিত হয়েছে, বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনের বিস্তারিত কাহিনিগুলি কাব্যে, সাহিত্যে ও দর্শনের বিভিন্ন ধারায় তার গৌরবগাথা অমর কাহিনিতে ভক্তিরস আপ্লুত করেছে। রাসলীলা তারি এক বিশেষ অধ্যায়। ভক্তির ভাবতরঙ্গ এমনই প্রবল, তার স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। পরমাত্মিক প্রেমের টানও কম নয়, ভাবগ্রাহীও ভাব সাগরে ডুব দিতে দিতে কখন যে- সে অনন্ত সাগরের অতলে তলিয়েছে, হারিয়েছে নিজেকে, অমৃতের আস্বাদনে, আনন্দ লহরীতে, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে বিভোর হয়েছিল অনেকক্ষণ, তারি স্মৃতি, মনের মণিকোঠায় ভেসে এল সেদিন।

ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, তার প্রতিদানে তিনিও তার নির্দশন দেন। কথিত আছে, ভগবানকে গোপ-গোপীরাই যথার্থ চেনে ও জানে। তারা যে ভগবানের সাথে কথা বলে, রাস করে। গোপী অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরপ্রেমী, গোপনে-গোপনে, একান্তে, একের সাথে পরমাত্মিক মধুর মিলনে একাত্মরূপে অমৃত রস আস্বাদনে, আনন্দ লহরীতে মনময়ূরী নৃত্য করে, সেখানে বিকারী আত্মার প্রবেশ নেই।

এই অপার্থিব রাসলীলায়, একদিকে মধুবনে যেখানে মুরলী বাজে (কাঠের নয় অমৃত সুর ধ্বনি) আর মধুবৃন্দাবনে যেখানে রাস হত, সূক্ষ্মে আর স্থূলে, ভক্তি আর জ্ঞানের রস মাধুরীতে আজও স্মৃতির স্মারক হয়ে আছে।

রাসলীলা, সাকার, আকার ও নিরাকার তিনভাবেই তিনি লীলা করেন। আধার অনুসারে, যে যেমন, ভাব যেমন, লাভ ও তেমন। শুদ্ধতার আধারে ভক্তিও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় তাঁর লীলাকে অনুধাবন করাও সেরূপ হয়, ভক্তি যখন চরম সীমায় পৌঁছায়, অন্তর আত্মা তখন এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরমাত্মার সাথে মহামিলনে মন ব্যাকুল হয়; লীলাময়ের লীলা শুরু হয়, পূর্ণ কর্মের ফলে, নানাভাবের উত্তরণে মহাভাবের উদয় হলে, আসে অভেদ জ্ঞান, তার ব্যাখ্যা অনেক, ভগবানের এ-এক বিচিত্র লীলা। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ওই গুহ্য তথ্য জ্ঞাত হয়।

আত্মা বিদেহী অবস্থায়, শুধু একজনমে পরমাত্মার সাথে অতি সূক্ষ্মে মধুর মিলনে যে উপলব্ধির আস্বাদন হয়, যে শক্তি ও গুণের প্রাপ্তি ঘটে তারি বহিঃপ্রকাশ কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে।

ভক্তির সামগ্রীতে (কাব্যে, সাহিত্যে) নিরাকার পরমাত্মার অদৃশ্য শক্তির মাধুরীতে যে লীলা প্রসঙ্গ এসেছে তারি স্থানে সাকার শ্রীকৃষ্ণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সে রাসলীলাও মনোগ্রাহী শুধু নয়, ব্যাপক বিস্তারে ও রস ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত্রে লীলায়িত ছন্দে ভরা, শিশুকাল থেকে যৌবন অবধি নানা পরিস্থিতিতে খেলার ছলে হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে বিজয়ী হতে কারও সাহায্যের প্রয়োজন পড়েনি। ছলনাময়ী রাক্ষুসী পূতনা থেকে শুরু করে দুরাচারী কংসকেও তিনি বীর বিক্রমে সাজা দিয়েছিলেন।

গোপী অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরপ্রেমী, গোপনে-গোপনে, একান্তে, একের সাথে পরমাত্মিক মধুর মিলনে একাত্মরূপে অমৃত রস আস্বাদনে, আনন্দ লহরীতে মনময়ূরী নৃত্য করে, সেখানে বিকারী আত্মার প্রবেশ নেই।

'ননী চুরি', 'মাখন চুরি' কাহিনির মধ্যে বাৎসল্য প্রেমের মেলবন্ধনে এক অপূর্ব লুকোচুরির খেলায় ব্যস্ত, ওই চুরি সাধারণ চুরি নয়, আত্মিক স্নেহের মেলবন্ধনে, বিশেষতা ও গুণের রসদগুলি সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে অনুধাবন করাতে গিয়ে একটি কথা মনে হল, শ্রীকৃষ্ণ দেহধারী, তাই তাঁকে জন্মের আবর্তে আসতে হয়েছে, কলিযুগের শেষে, সঙ্গমে তার অন্তিম জনমে, অলৌকিক ভাবের যে উন্মেষ ঘটেছে তার মূল কারণ, পরমপিতা পরমাত্মা তারি শরীরে অবতারিত হয়ে তাকে দিব্য সাক্ষাৎকার করিয়ে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে রচনা করায়, আমাদের অনেক সূক্ষ্ম তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এ যে এক বিচিত্রলীলা, যা বিশ্ব-নাটকের অন্তর্গত গুপ্ত রহস্য। এই পরমাত্মিক, অপার্থিব রাসলীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তারি মাহাত্ম্য স্থূলে প্রচারিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে।

ডাক

ব্রহ্মাকুমার বলরাম
- শ্যামনগর

ডাক দিয়েছে ভগবান
আয় ছুটে আয় ভাগ্যবান,
পঁচিশ বছর কিংবা বেশি
দৈব জীবন হাসিখুশি।

শান্তিবনে, শান্ত মনে
আয় নিয়ে যা বরদান,
যোগী জীবন, পবিত্র মন
সবাই হবি বাপ সমান।

হীরা, মুক্তা, সোনার মুকুট
তিন, সাত, তের-তে যা যাই উঠুক
সম্মান সমারোহ সম্মেলন
আত্ম-জ্যোতি উন্মীলন।

শিবের জ্যোতি প্রিয় অতি
বিশ্ব গড়ার মেরামতি, কেরামতি
পরমাত্মা হীরার খনি
বাবা বলে তাকেই জানি।

রাজার রাজা, মহারাজা
বি. কে. আত্মা সুমহান
সত্যযুগে স্বর্গ পাবি
সব বিষয়ে বাপ সমান।

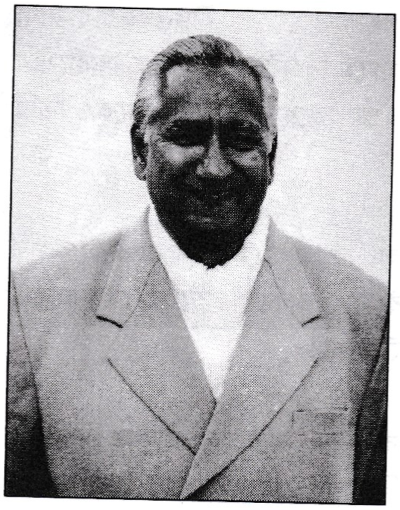

বাবার সঙ্গের রঙ মেখেছি

-ব্রহ্মাকুমার নির্বের
আবু পর্বত

ব্রহ্মাবাবার শরীরে শিববাবার প্রবেশের পূর্বে প্রকৃত সত্যকে জানতে ও সাত্ত্বিক জীবন ধারণের জন্য ব্রহ্মাবাবা একের পর এক গুরুর সান্নিধ্যে এসেছেন। এক, দুই, তিন, চার করতে করতে ১২জন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুম্বাইয়ের বাবুলনাথ মন্দিরের গেস্ট হাউসে বাবা এসেছিলেন। সাল ১৯৩৬ হবে। তাঁর ১২তম গুরু ওখানেই অবস্থান করছিলেন আর ঠিক ওই সময়ে শিববাবা ব্রহ্মাবাবাকে তাঁর নিজের সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন। ব্রহ্মাবাবা ভেবেছিলেন এসব আমার এই গুরুরই কৃপা। গুরুজির কাছে এই খুশির সংবাদ নিয়ে গেলেন। গুরুজি পরিষ্কার ব্রহ্মাবাবাকে জানিয়ে দিলেন, এসব আমার কৃপায় নয়। এরপরই বাবার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেল। বাবা তাঁর অংশীদারের থেকে নিজের অংশ নিয়ে নেলেন। যেটুকু পেলেন তা দিয়ে যজ্ঞ স্থাপনের 'বীজ' বপন করলেন। সেই বীজ আজ বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করে দেশ-বিদেশে ছেয়ে মহিরুহতে পরিণত হয়েছে।

সাগর পারের পর পর্বতে তপস্যা

যজ্ঞের শুরুতে ৩৮০ জন ভাইবোন ছিলেন। ছোট বাচ্চা থেকে বড়, পরিবারের পর পরিবার যজ্ঞে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। এক বছর হায়দরাবাদ সিন্ধে, তারপর ১২ বছর করাচীতে কাটিয়ে ১৯৫০ সালে যজ্ঞ আবুতে স্থানান্তরিত হয়। শিববাবার আদেশ ছিল সাগরের পারে অনেক তপস্যা হয়েছে এবার পর্বতগাত্রে তপস্যা করতে হবে। আলাপ-আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাউন্ট আবুর পর্বত সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়েছে।

আত্মানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব

আমি ১৯৫৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারিতে জ্ঞানে এসেছি। বাবার সাথে আমার সাক্ষাৎ ওই বছরেরই ১৩ই জুলাই। বাবার সঙ্গের স্মৃতি আজও পর্যন্ত আমার স্মৃতিপটে পূর্ণাঙ্গরূপে অঙ্কিত হয়ে আছে। আজও পর্যন্ত যার বিন্দুমাত্র ইতরবিশেষ হয়নি। মনে হয় ওসবই আজকের ঘটনা। বাবার সাথে দশবছর কাটানোর পরম সৌভাগ্য আমার। এই দশবছরে বহুবার মধুবনে এসেছি, সাকার বাবার সঙ্গ নিয়েছি। বাবার অব্যক্ত হওয়ার পর দাদিজি আবুতে থাকা শুরু করলেন। আমাকেও তিনি মুম্বাই থেকে এখানে ডেকে নিলেন। সাকার বাবার সাথে সাক্ষাৎকার এই সময় যেমন হয় ওই সময়ও ওরকমই হত যেমন গুলজার দাদি ডায়মন্ড হলের মঞ্চে বসেন, বাবা আসেন আর রুহানী সাক্ষাৎ করেন, এক-এক করে সবাইকে দৃষ্টি দেন। সবার সাথে তাঁর মিলন হয়। আমার সাথে বাবার সাক্ষাৎ হয়েছিল বাবা যখন গদিতে বসেছিলেন, পাশে মাম্মা বসেছিলেন। বাবা দৃষ্টি দিয়েই চলেছেন। আমার মনে এক সংকল্প চলছিল, বাবার সম্বন্ধে আমি মুরলীতে জেনেছি, পত্রের দ্বারা জেনেছি, আজ আমি সাকার অনুভব করব। বাবার সামনে বড়জোর ৩০-৪০ সেকেন্ড ছিলাম, বাবার কপালে লাইট, লাল-লাল লাগেনি, একেবারে সাদা আলো বিকিরিত হচ্ছিল। দৃষ্টিতে বাবার অপার স্নেহ এবং শক্তি অনুভব হয়েছে। এরই ফলে আত্মানুভূতি ও অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হয়েছে। এই অনুভব হওয়ার জন্য প্রথমে যা হল তাহল 'নিশ্চয়' আরো মজবুত হলো। সত্যিই ভগবানই সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে এসে নিজের মহান অভিনয় মঞ্চস্থ করেন। আজ থেকে আমার জীবন আপনার সেবায় উৎসর্গ করলাম। মনে মনে বাবার কাছে বিষয়টা রাখলাম, বাবাও তা স্বীকার করে নিলেন। ১০-১২ মিনিট পর্যন্ত অনুপম ওই অনুভবে ডুবেছিলাম। এরপর বাবা আমাকে

বুকে টেনে নিলেন, বাবার কাছে গেছি, বাবা মুখ মিঠা করিয়েছেন। আমার সাথে আর এক ভাই ছিল, সেও বাবার সাথে মিলেছে। বাবা ভীষণ স্নেহে সব খবরাখবর নিলেন এবং কিছু জ্ঞানের কথা শোনান।

জ্ঞান দান করে প্রাতরাশ

বাবার লৌকিক ভাব-স্বভাব-এর প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। চলমান দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি বাবা সময় ব্যয় করতেন না। মুরলীর প্রতি বাবার ছিল অগাধ প্রেম। আমারও আকর্ষণ বাবার কপাল আর চোখের দিকে থাকত। বাবার বাণী নিশ্চয়ই টেপ-রেকর্ডারে শুনে থাকবেন। এরকম আওয়াজ দুনিয়াতে কারো হয় না। বাবার আওয়াজে তীক্ষ্ণতা তা আর হওয়ার নয়। বাবার সাথে আমার সাক্ষাতের পর বাবা বলেছিলেন, বাছা, আজ সকালে বাবার মুরলী খব সুন্দর ছিল। বাবা অনেক অমূল্য জ্ঞানরত্ন দিয়েছেন। প্রথমে মুরলী পড়। বাবা এরকম বলেননি যে, বাবার সাথে দেখা করেছ, অতএব ভোজন করো না, প্রথমে মুরলী পড় তারপর ভোজন কর। বাবার এটা একটা সিদ্ধান্ত ছিল। যা পরবর্তীকালে আমাকে নিয়মবদ্ধ করিয়েছে। সবার প্রথমে বাবাকে স্মরণ, তারপর মুরলী এরপর কাউকে অন্তত কিছু জ্ঞানদান তারপর প্রাতরাশ কর।

বাবার সামনে বড়জোর ৩০-৪০ সেকেন্ড ছিলাম, বাবার কপালে লাইট, লাল-লাল লাগেনি, একেবারে সাদা আলো বিকিরিত হচ্ছিল। দৃষ্টিতে বাবার অপার স্নেহ এবং শক্তি অনুভব হয়েছে।

বাবার দৃষ্টিতে সদা বিশাল সেবাই ছিল

যখন আমি প্রথম দিকে বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসি তখন বাইরের পাঁচ-ছজন হবে। কিন্তু মুরলীতে ফুটনোট লিখে পাঠানো হত মধুবন জাঁকজমকে পূর্ণ। আমি বাবার কাছে এক সপ্তাহের জন্য ছিলাম। ভাবুন সারাদিন আমাদের কীভাবে কাটত! সকালের একেবারে প্রথমে ১০-১৫ মিনিট মেডিটেশন হত। তারপর মুরলীর ক্লাস, পরের সময়টুকু মাম্মার ঘরে বসতাম। কেউ কবিতা শোনাত, কেউ গান করত, বাবা দু-চার কথা বলতেন, তারপর আদর করে কাছে নিয়ে প্রসাদ খাওয়াতেন। ঈশ্বরীয় ভালোবাসা, ঈশ্বরীয় পালন ওই সময় মাম্মা ও বাবা বাস্তবিকই দিয়েছেন। এরপরে আমরা প্রাতরাশ করতাম। ওই দিনের মুরলীর উপর ভিত্তি করে বাবা বড়ো দাদি, জানকী দাদি, গুলজার দাদি, জগদীশ ভাই, গঙ্গে দাদি প্রমুখ যাঁরা বিশেষ সেবাধারী ছিলেন, তাঁদের চটপট পত্র লিখতেন - আজ বাবা কত জ্ঞান দিয়েছেন। এসব আন্তরিক ভাবে অধ্যয়ন করে অন্যকে বোঝাবে। বাবার সামনে বিশাল সেবার ভাবনা থাকত। সেই অনুযায়ী বাবা সবাইকে পত্র দিতেন। কারো চিঠি এলে বাবা তাকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতেন। কখনই সাধারণ একটি চিঠি লিখে তাকে সাইক্লোস্টাইল করে পাঠাতেন না। ভাবুন, ওসব দিনে বাবাকে ব্যক্তিগত কত চিঠি লিখতে হত। বাবা সকালে ও দুপুরে এই দুই সময়ে চিঠি লিখতেন। কমপক্ষে ৩০-৩৫টি পত্র লিখতে হত। যে সেবার নিমিত্ত থাকতেন তাঁর কাছে পত্র না পৌঁছালে কতই না তিনি উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতেন। আজ বাবার পত্র কেন এল না। ব্রহ্মাভোজন শুরু করার পূর্বে যতই ভাইবোন থাকুক না কেন। বাবা প্রত্যেককে ডেকে নিজের হাতে অবশ্যই খাওয়াতেন। ছিল তো সবাই বড় বড়, শরীর তো সবারই বড় ছিল, কেউ ছোট ছিল না যে মুখে খাইয়ে দিতে হবে। কিন্তু বাবার ছিল অপার স্নেহ আর প্রত্যেকটি বিষয়ে ছিল বিশেষ 'রাজ'। কোন বাচ্চা বাবার সামনে এলে বাবা তাকে এমনভাবে দৃষ্টি দিতেন যাতে বাচ্চার দৃষ্টি খাবারের প্রতি না যায়। বাবা প্রসাদ খাওয়ান বা প্রসাদে পাথর খাওয়ান, 'দৃষ্টির মহত্ব' জিনিসের চেয়ে বেশি থাকত। এরকমই বাবা এত স্নেহ-প্রেম দিয়ে পালন করেছেন।

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

- ব্রহ্মাকুমারী শুক্লা
পায়রাডাঙা, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ

আমার বয়স ৫০ বছর। আমার এক ভক্ত পরিবারে জন্ম হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই খুব আবেগপ্রবণ ছিলাম। ছোট ছোট কারণে খুব চিন্তা করতাম, বাবা, মা, ভাই, বোনেদের জন্য। আমি যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই তখন আমার মায়ের বড় অপারেশন হয়। আমি খুব চিন্তা করতাম, মা মরে যাবে না তো? এই ধরনের ব্যর্থ চিন্তা করতাম আর কষ্ট পেতাম। তখন থেকেই আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল। আমার বাবা, মা ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সেই কারণে আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা বাবা, মায়ের মুখে শুনতাম। বাবা মাঝে মাঝে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান শোনাতেন। কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে আমার মনে অনেক প্রশ্ন জমতে থাকে। এরপর ১৯৮৩ সালে আমার বিয়ে হয়। সেখানে গিয়ে আমার চিন্তা আরও বেড়ে গেল। বাপের বাড়ির সাথে সাথে শ্বশুরবাড়ির সবাই কি করে ভাল থাকবে, এই নিয়ে সব সময় চিন্তায় থাকতাম। আমার সৌভাগ্য যে, আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। আমার স্বামীও গুরুমুখী ছিলেন। তাই আমিও গুরু দীক্ষা নিলাম। আমরা গুরুবাণী সব সময় আলোচনা করতাম। কিন্তু আমার মনে আধ্যাত্মিক প্রশ্নের ঝড় দিনে দিনে বাড়তে লাগল। এরপর আমার এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। আমার চিন্তা অনেক বড় আকারে টেন্‌শনে পরিণত হল। এর ফলে আমার বুকের ধড়ফড় ও শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিল। ডাক্তার বললেন, টেন্‌শন্ কমান, সুস্থ হয়ে যাবেন। এখন আমি আমার স্বামীর চাকরির জায়গায় কোয়ার্টারে থাকি। আমার সংসারে বড় কোন অশান্তি ছিল না। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে এই নিয়ে সংসার, কিন্তু আমার দুর্বল মন আমাকে শান্তিতে থাকতে দিত না। আমার টেন্‌শন্ বেড়ে চলল, ঘুমের বড়ি ও ডাক্তারের ঔষধ নিয়মিত খেতাম কিন্তু পেতাম না।

আমার টেন্‌শন্ ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনের আকার নেয়। সব সময় ব্যর্থ চিন্তা মনের মধ্যে আসতে থাকতো। আমি ঔষধ খাওয়ার সাথে সাথে সৎসঙ্গ শুনতে লাগলাম। যদি মনকে নিশ্চিন্ত করা যায়। সংস্কার ও আস্থা চ্যানেলে সময় পেলেই সৎসঙ্গ শুনতাম, এবং জপ, ধ্যান করতাম এতে আমার মনোবল কিছুটা বেড়েছিল কিন্তু মনের চিন্তা কমেনি। এরপর আমার বুকের ধড়ফড় খুব বেড়ে যায়, ঘুম নষ্ট হয়ে যায় এবং মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়। মনে হত মাথার সমস্ত নার্ভ ছিঁড়ে যাবে। ভগবানকে সব সময় ডাকতাম আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও। হঠাৎ একদিন আস্থা চ্যানেলে দেখলাম ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে শিবানী বোন ও কানুপ্রিয়াজির কথোপকথন, মেডিটেশনের মাধ্যমে টেন্‌শন্ মুক্ত জীবন কীভাবে লাভ করা যায়। আমি রোজ শুনতে লাগলাম। ভগবান শিবের কথাও শুনতাম, খুব ভাল লাগত। কিন্তু কোথায় এই বিশ্ব বিদ্যালয় আছে জানতাম না। আমরা এখন গ্রামে (পায়রাডাঙ্গা) বাড়ি বানিয়েছি। এখানে প্রতি বছর বইমেলা হয়। আমি বইমেলা দেখতে গিয়েছি। হঠাৎ এক ভাই আমাকে একটা লিফলেট হাতে দেয়, আমি লিফলেট বাড়ি নিয়ে আসি। পরের দিন লিফলেট খুলে দেখি লেখা আছে, ৭দিনের কোর্স করে মেডিটেশন্ শিখে টেন্‌শন্, ডিপ্রেশন মুক্ত জীবন লাভ করুন এবং সুখ ও শান্তি অনুভব করুন। আমি ঠিকানা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আশ্চর্যের কথা আমার বাড়ি থেকে মাত্র ১০ মিনিটের রাস্তা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব

বিদ্যালয় সেন্টার। সেদিন তারিখ ছিল ১৯/০৮/২০১০। আমি সেন্টারের ভিতর গিয়ে দেখলাম একটা ঘরের মধ্যে ভগবানের গান হচ্ছে আর সারা ঘরে লাল আলো জ্বালানো। সবাই মেডিটেশন করছে। আমি একপাশে বসে পরলাম। আমার চারিদিকে শান্তি ছেয়ে গেল, এক মুহূর্তে মনে হল আমার সব কষ্ট চলে গেল। কোন ছোট বাচ্চা যদি হারিয়ে যায়, তার তখন কত কষ্ট থাকে, চিন্তায় ভয়ে সে কান্না করতে থাকে। এরপর হঠাৎ যদি সেই বাচ্চা দেখে, তার বাবাকে সে খুঁজে পেয়েছে এবং তার কোলে বসে আছে। তখন তার ভয় ও চিন্তা তো চলে যাবে, কিন্তু অভিমানে চোখ থেকে জল পড়বে।

সেই সেন্টারে বাবার ঘরে বসে আমারও ঠিক সেই অনুভব হচ্ছিল আর দুচোখ থেকে জল পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর সেই সেন্টারের টিচার আসলেন। শুভ্রবস্ত্র পরনে, শান্ত, সৌম্য ও স্নেহভরা দৃষ্টিতে আমাকে বললেন, আপনি ৭ দিনের কোর্স করবেন? আমি রাজি হয়ে গেলাম। এরপর আমি বাড়ি ফিরে আসি এবং আমার স্বামী ও সন্তানদের আমার অনুভবের কথা ও ৭ দিনের কোর্স করার কথা বলি। আমার স্বামী ও সন্তানেরা সেন্টারে গিয়ে ৭ দিনের কোর্স করার জন্য উৎসাহিত করে । আমি পরের দিন সেন্টারে যাই এবং ১ঘণ্টা কোর্স করি। তৃতীয় দিন টিচার দিদি ভগবানের পরিচয় দিয়ে বললেন, পরমপিতা পরমাত্মা শিব, আমরা ভালবেসে 'বাবা' বলে ডাকি। তখন আমার মনে হল, এই সেন্টার যেন এক রুহানি হাসপাতাল স্বয়ং ভগবান শিববাবা যেন এই হাসপাতালের রুহাণী ডাক্তার। শুভ্রবেশধারী টিচার দিদিরা যেন রুহানি নার্স। আমার ডাক্তার বাবার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রুহানি নার্স দিদি ৭দিনের কোর্স খুব যত্ন সহকারে বুঝিয়ে দিলেন। এই ৭দিনের কোর্সে যেন জ্ঞানের ইনজেক্‌শন ও যোগের অক্সিজেন। আমাকে মেডিটেশন শিখিয়ে দিলেন টিচার দিদি। আমার কষ্ট অনেকটাই কমে গেল। এরপর আমি ১ ঘণ্টার জন্য যেতাম মুরলী শুনতে, শুনে আমার মনে হত এ যেন রোগীর পথ্য। যদি কারোর সুগার হয়, ঔষধের সঙ্গে ডাক্তার বলেন, মিষ্টি খাবেন না, আলু খাবেন না, ভাত বেশি খাবেন না, সকালে হেঁটে বেড়াবেন ইত্যাদি। মুরলী ঠিক সেই রকম জীবনে কীভাবে চলতে হবে, কী কী চিন্তা করতে হবে, কী করে মনোবল বাড়াতে হবে, এই সব শেখান আমার ডাক্তার বাবা। এর মধ্যে মেডিটেশন শিখে নিয়েছি। এখন আমি প্রত্যহ ভোর ৪টে থেকে ৫টা পর্যন্ত মেডিটেশন করি। আর সারাদিন মুরলী অর্থাৎ ভগবানের মহাবাক্য যা আমি সেন্টার থেকে লিখে নিয়ে আসি, সময় পেলেই পড়ি এবং নিজের জীবনে অনুভব করার চেষ্টা করি।

আমার সেই আধ্যাত্মিক প্রশ্নের ঝড় সব থেমে গিয়েছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি। মন আমার খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং ভগবান আমার বাবা

তিনমাস আমি প্রতিদিন নিয়ম করে সেন্টারে যাই এবং মেডিটেশন করি এবং মুরলী শুনতে থাকি। তিনমাসের মধ্যে আমি শারীরিক ও মানসিক সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। আর আমার সেই আধ্যাত্মিক প্রশ্নের ঝড় সব থেমে গিয়েছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি। মন আমার খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং ভগবান আমার বাবা, ডাক্তার - তাই তো আমি এখন হেল্দি, নিরোগ এবং শক্তিশালী। সুখ, শান্তি, খুশি ও আনন্দে জীবন অতিবাহিত করছি।

এমন কাজ করোনা যাতে দুঃসময়ে লোক তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে

ভগবানের অবতরণ

- ব্রহ্মাকুমার গৌতম নিরসা

কল্পশেষে ভগবান শিব নিরাকার।
ধরণীর সর্বজীব করেন উদ্ধার।।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের পরে কলিশেষ।
বৃদ্ধদেহে শিব আসেন নির্বিশেষ।।
সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন।
এক বর্ণ নহে মিথ্যা রাখিবে স্মরণ।।
ব্রহ্মা মুখে পরমাত্মা শিব অভিধান।
ব্রাহ্মণেরে গীতাজ্ঞান শ্রবণ করান।।
গীতাজ্ঞান শ্রবণ করেন যে ব্রাহ্মণগণ।
সত্যযুগে দেবপদের অধিকারী হন।।
গীতাজ্ঞান অমৃতস্বরূপ যে করে পান।
অতি অবহেলে তিনি স্বর্গে চলে যান।।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগ হয়।
চার যুগে এক কল্প গণনাতে কয়।।
অর্ধকল্প ব্রহ্মার রাত্রি বলে জানি।
বাকি কল্প ব্রহ্মার দিন বলে মানি।।
গীতাজ্ঞান শ্রবণে দিন আরম্ভ হয়।
অজ্ঞান অন্ধকারে রাত্রি শুরু হয়।।
ভক্তি-পূজা-পাঠ আদি দ্বাপরেতে হয়।
সত্য-ত্রেতা দুই যুগ পূজা নাহি হয়।।
স্বর্গ অতি মনোরম পবিত্র ধাম।
আনন্দলোক যেথা নাহি ক্রোধ-কাম।।
দুঃখ নাহি লেশমাত্র চির সুখময়।
অমরলোক কহে যেথা নাহি মৃত্যুভয়।।
রোগ-শোক-দুঃখ শূন্য বৈকুণ্ঠপুরী।
সুখধাম নাম যার দেন ত্রিপুরারি।।
ঈর্ষা-দ্বেষ নাহি সেথা অতির মাধ্যম।
চিরশান্তি বিরাজ করে নাহি দুঃখের নাম।।
শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য করে সেই সুখধামে।
প্রজা অতি সুখে থাকে শ্রীকৃষ্ণ সনে।।

রানিগঞ্জ ঃ শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে জীবন্ত দুর্গা প্রদশনী।

নিরসা ঃ রাজযোগ প্রদর্শনী, উদ্বোধনে মহাপ্রবন্ধক ভ্রাতা পবনকুমার সিং, মুগমা অঞ্চল, সাথে বি. কে. শক্তি।

গুমলা ঃ শান্তির সাগরের শান্তির বাণী 'শান্তিদূত' বহিছে আনি সাথে বি.কে. প্রমীলা, বি. কে. অঞ্জলি, বি. কে. কানন।

বর্ধমান ঃ রসুলপুর, রাজযোগ প্রদর্শনীতে উপস্থিত দর্শনার্থীদের ঈশ্বরের পরিচয় দিচ্ছেন বি. কে. মীনা।

শিমূরালি ঃ শারদীয়ায় শিমূরালি জীবন্ত দুর্গা বহিছে আনি অসুর নিধনে নবীনের বাণী স্বর্গ যে আজ আসিছে নামি।

লোহারদাগা ঃ বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপনে 'শান্তিদূত'-এর সাইকেল যাত্রা।

কুড়ু ঃ 'শান্তিদূত' শান্তির বাণী বহিছে আনি কুড়ু শহরে সাথে বি.কে. শান্তি, বি.কে. রজনী।

Vol.2, Issue 5, RNI No.WBBEN/2012/42493, Dec 2013 - Jan 2014, Price ₹10/- only

কটক ঃ অহিংস সমাজ গঠন বিষয়ক অনুষ্ঠানে ভ্রাতা বি. কে. বৃজমোহন, ভ্রাতা বিচারপতি শ্রদ্ধেয় বি. কে. নায়ক, রাজযোগিনী দাদি রতনমোহিনীজি ও বি. কে. কমলেশ ।

কলকাতা মিউজিয়াম ঃ জীবন্ত দুর্গা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী ভগিনী সমর্পিতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভ্রাতা বিশ্বনাথ আগরওয়ালজি সাথে বি. কে. কানন।

লেক গার্ডেনস্ ঃ সারেগামা খ্যাত ভ্রাতা অনীক ধরের লেক গার্ডেনস্ সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন উপলক্ষে অভিনেত্রী সুনীতা সান্যাল সাথে বি. কে. রুমকি, বি. কে. মাধুরি ও বি. কে. কানন।

Printed & Published by Brahma Kumari Kanan on behalf of Owner, Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya. Printed at Alpha Print House, 15E, Chowl Patty Road, Beliaghata, Kolkata-700010 and Published at Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya, 1A, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700020. Editor's Name & Address: Samir Krishna Das, 11/2, West Road, Santoshpur, Kolkata-700075.